যে, তোমরা সবাই জান যে, মক্কার কুরায়শ হোক বা আমাদের গাতফান গোত্র হোক বা অন্যান্য ইহুদী গোত্র হোক---এদের কারো মাতৃভূমি বা দেশ এটা নয়। যদি তারা পরাজিত হয়ে পালিয়ে যায় তবে তাদের কোন ক্ষতি নেই, কিন্তু তোমাদের ব্যাপারটা তাদের থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, মদীনা তোমাদের মাতৃভূমি, তোমাদের পরিবার-পরিজন, ধনসম্পদ সবই এখানে। যদি তোমরা তাদের পক্ষ নিয়ে যুদ্ধে অংশগ্রহণ কর---পরিণামে যদি এরা পরাজিত হয়ে পালিয়ে যায়, তবে তোমাদের কি গতি হবে? তোমরা মুসলমানদের সাথে মুকাবিলা করে টিকে থাকতে পারবে কি? তাই আমি তোমাদের হিতাকাঙক্ষী হয়ে এ পরামর্শ দিচ্ছি যে, যে পর্যন্ত এরা তাদের কিছুসংখ্যক বিশিষ্ট নেতাকে তোমাদের নিকটে যিম্মি হিসাবে না রাখে ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধে অংশগ্রহণ করো না---যাতে তারা তোমাদেরকে মুসলমানদের মুখোমুখি ঠেলে দিয়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম না হয়। তাঁর এ পরামর্শ বনূ কুরায়যার বেশ মনঃপূত হলো এবং যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়ে তারা বলল যে, আপনি উত্তম পরামর্শ দিয়েছেন।

অতপর নুয়াইম (রা) কুরায়শ দলপতিদের নিকটে যান এবং তাদের বলেন যে, আপনারা জানেন যে, আমি আপনাদের আন্তরিক বন্ধু এবং মুহাম্মদ (সা)-এর সংগে আমার কোন সম্পর্ক নেই। আমি একটা সংবাদ পেলাম---আপনাদের একান্ত সুহৃদ বলে এ সম্পর্কে আপনাদেরকে অবহিত করা আমার বিশেষ কর্তব্য। অবশ্যই আপনারা আমার নাম প্রকাশ করতে পারবেন না। সংবাদটি এই যে, বনূ কুরায়যা আপনাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হওয়ার পর এরূপ সিদ্ধান্তের জন্য তারা অনুতপ্ত এবং তারা মুহাম্মদ (সা)-কে এ সম্পর্কে এই বলে অবহিত করে দিয়েছে যে, আপনারা কি আমাদের এ শর্তে সম্মতি প্রদান করতে পারেন যে, আমরা কুরায়শ ও গাতফান গোত্রের কতিপয় নেতাকে এনে আপনাদের হাতে তুলে দেব আপনারা তাদেরকে হত্যা করবেন, অতপর আমরা আপনাদের সাথে একত্রিত হয়ে এদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হব। মুহাম্মদ (সা) তাদের এ প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন। এখন বনূ কুরায়যা যিম্মি হিসাবে আপনাদের কিছু সংখ্যক নেতাকে তাদের নিকটে সমর্পণ করার জন্য দাবি পেশ করতে যাচ্ছে। এখন আপনাদের ব্যাপার---নিজেরা ভালভাবে ভেবেচিন্তে দেখুন।

অতপর নুয়াইম (রা) নিজের গোত্র বনূ গাতফানের নিকট গেলেন এবং তাদেরকেও এ সংবাদই শোনালেন। এর সাথে সাথেই আবূ সুফিয়ান কুরায়শদের পক্ষ থেকে ইকরামা বিন আবূ জেহেলকে এবং বনূ গাতফানের পক্ষ থেকে ওয়ার্কা বিন্ গাতফানকে এ কাজের জন্য নিযুক্ত করলো যে, তারা বনূ কোরায়যার নিকট গিয়ে একথা বলবে যে, আমাদের যুদ্ধোপকরণ নিঃশেষ হওয়ার পথে এবং আমাদের লোক অবিরাম যুদ্ধের কারণে ক্লান্ত ও নিরুৎসাহিত হয়ে পড়ছে---আমরা চুক্তি অনুসারে আপনাদের সাহায্য ও যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য প্রতীক্ষারত। উত্তরে বনূ কোরায়যা বলল, যে পর্যন্ত তোমাদের উভয় গোত্রের কিছু সংখ্যক নেতাকে যিম্মি হিসাবে আমাদের হাতে সমর্পণ না করা হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবো না। ইকরামা ও ওয়ার্কা এ সংবাদ আবূ সুফিয়ানের নিকট পৌঁছালে পর গাতফান ও কুরায়শ নেতৃবৃন্দ পূর্ণভাবে

বিশ্বাস করলো যে, নুয়াইম বিন মাসুদ (রা)-এর প্রদত্ত সংবাদ সম্পূর্ণ ঠিক। তারা বনূ কুরায়যার নিকট সংবাদ পাঠিয়ে দিল যে, আমাদের কোন লোক আপনাদের হাতে সমর্পণ করা যাবে না। এখন মনে চাইলে আপনারা আমাদের সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করুন আর না চাইলে না করুন। এ অবস্থা দেখে হযরত নুয়াইম প্রদত্ত সংবাদের উপর বনূ কুরায়যার বিশ্বাস আরো দৃঢ় ও ঘনীভূত হল। এরূপভাবে আল্লাহ্ শত্রু পক্ষের এক ব্যক্তির মাধ্যমে তাদের পরস্পরের মধ্যে বিভেদ ও ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি করে তাদেরকে বিচ্ছিন্ন ও দুর্বল করে দেন।

তদুপরি তাদের উপর আকাশ থেকে এই বিপদ ও বিপর্যয় নেমে এলো যে, এক প্রচণ্ড বায়ু তাদের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে তাদের তাঁবুগুলো ভূলুণ্ঠিত করে দিল—চুলোর হাঁড়ি-পাতিল পর্যন্ত উড়িয়ে নিয়ে গেল। তাদেরকে মূলোৎপাটিত ও ছিন্নভিন্ন করার জন্য এগুলো তো ছিল আল্লাহ্ পাকের বাহ্যিক মাধ্যম ও উপকরণ। তদুপরি অভ্যন্তরীণভাবে তাদের অন্তরে ভীতি সঞ্চারের জন্য আল্লাহ্ পাক তদীয় ফেরেশতা-মণ্ডলীকে প্রেরণ করেন। উল্লিখিত আয়াতসমূহে আল্লাহ পাকের এই উভয়বিধ সাহায্যের বর্ণনা এরূপভাবে দেওয়া হয়েছেঃ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا

অর্থাৎ অতপর আমি তাদের উপর দিয়ে প্রচণ্ড বায়ু প্রবাহিত করে দেই এবং এমন এক সৈন্যবাহিনী পাঠিয়ে দেই, যা তোমাদের দৃষ্টিগোচর ছিল না। এর ফলে তাদের পক্ষে পালিয়ে যাওয়া ব্যতীত অন্য কোন পথ ছিল না।

হযরত হুযায়ফা (রা)-র শত্রু সৈন্যের মাঝে গমন ও খবর নিয়ে আসার ঘটনাঃ অপর দিকে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র নিকট হযরত নুয়াইম (রা) অনুসৃত ভূমিকা ও কার্য বিবরণ এবং শত্রু বাহিনীর মাঝে বিভেদ সৃষ্টিজনিত ঘটনাবলীর সংবাদ পৌঁছুলে পর তিনি নিজেদের কোন লোক পাঠিয়ে শত্রুপক্ষের অবস্থা ও তাদের গতিবিধি সম্পর্কে সঠিক তথ্য সংগ্রহের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। কিন্তু শত্রুদের উদ্দেশে প্রেরিত সেই প্রচণ্ড হিম বায়ুর প্রভাব সমগ্র মদীনার উপর ছড়িয়ে পড়েছিল। মুসলমানগণও এই ঠাণ্ডায় কাতর হয়ে পড়েন। রাত্রিকাল সাহাবায়ে কিরাম সারাদিনের কঠোর পরিশ্রম ও শত্রুর মুকাবিলার ফলে ক্লান্ত ও অবসন্ন শরীরে প্রচণ্ড শীতের দরুন জড়সড় হয়ে বসে আছেন। সমবেত জনমণ্ডলীকে সম্বোধন করে রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন যে, শত্রুপক্ষের মধ্য থেকে তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে কেউ যাওয়ার জন্য প্রস্তুত আছে কি, যার বিনিময়ে আল্লাহ্ পাক তাকে জান্নাত প্রদান করবেন, উৎসর্গিত প্রাণ সাহাবায়ে কিরাম (রা)-এর সমাবেশ—কিন্তু অবস্থা এমন অপারক করে রেখেছিল যে, কেউ দাঁড়াতে সাহস পাচ্ছিলেন না। রসূলুল্লাহ্ (সা) নামাযে আত্মনিয়োগ করলেন। কিছুক্ষণ নামাযে লিপ্ত থাকার পর আবার জনমণ্ডলীকে সম্বোধন করে বললেনঃ শত্রু সৈন্যদের মধ্য থেকে তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করার জন্য দাঁড়াতে পারে এমন কেউ আছে কি?—প্রতিদানে আল্লাহ্ পাক তাকে বেহেশতে প্রবেশ করাবেন; এবার

গোটা সমাবেশ সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ। কেউ দাঁড়ালেন না। হুযুর (সা) আবার নামাযে দাঁড়ালেন, খানিকটা পরে তৃতীয়বারও একই রকম সম্বোধন করলেন, যে এ কাজ করবে সে আমার সাথে বেহেশতে অবস্থান করবে। কিন্তু সমবেত জনমণ্ডলী সারাদিনের প্রাণান্তকর পরিশ্রম, উপরের প্রচণ্ড শীত এবং কয়েক বেলা থেকে অভুক্ত থাকার দরুন এমন কাতর ও অবসন্ন হয়ে পড়েছিলেন যে, কেউ সাহসে ভর করে দাঁড়াতে পারছিলেন না।

হাদীসের বর্ণনাকারী হযরত হোযায়ফা বিন ইয়ামান (রা) বলেন ঃ অতপর রসূলুল্লাহ্ (সা) আমার নাম ধরে বললেন যে, তুমি যাও। আমার অবস্থাও অন্য সকলের মতই ছিল। কিন্তু নাম ধরে আদেশ করার দরুন তা পালন করা ব্যতীত কোন উপায় ছিল না।—আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম; কিন্তু প্রচণ্ড শীতে আমার শরীর থরথর করে কাঁপছিল। তিনি তাঁর হাত আমার মাথা ও মুখমণ্ডলে বুলিয়ে বললেন—শত্রু সেনাদের মাঝে গিয়ে কেবল সংবাদটা নিয়ে আমাকে দেবে এবং আমার নিকট ফিরে আসার আগে অন্য কোন কাজ করতে পারবে না।। অতপর তিনি আমার নিরাপত্তার জন্য দোয়া করলেন। আমি তীর-ধনুক তুলে নিয়ে সমর সজ্জায় সজ্জিত হয়ে শত্রু শিবির অভিমুখে রওয়ানা করলাম।

এখান থেকে রওয়ানার পর এক বিস্ময়কর ঘটনা দেখতে পেলাম। তাঁবুতে অবস্থানকালে শরীরে যে কম্পন ছিল, তা বন্ধ হয়ে গেল। আর আমি এমনভাবে চলতে ছিলাম যেন কোন গরম গোসলখানার ভেতরে আছি। এভাবে আমি শত্রু সেনাদের মাঝে পৌঁছে গেলাম। দেখতে পেলাম যে, ঝড়ে তাদের তাঁবু উৎপাটিত হয়ে গেছে—হাঁড়িপাতিল উল্টে পড়ে আছে। আবূ সুফিয়ান আগুনের পাশে বসে তাপ নিচ্ছিল। তাকে এরূপ অবস্থায় দেখে আমি তীর-ধনুক প্রস্তুত করতে উদ্যত হলাম। এমন সময় হুযূরের সে আদেশ স্মরণ পড়ল যে, ওখান থেকে ফিরে আসার আগে অন্য কোন কাজ করবে না। আবূ সুফিয়ান একেবারে আমার নাগালের মধ্যে ছিল। কিন্তু হুযূরের ফরমানের পরিপ্রেক্ষিতে তীর ধনুক থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেললাম। আবূ সুফিয়ান অবস্থা বেগতিক দেখে ফিরে যাওয়ার মর্মে ঘোষণা দিতে চাচ্ছিল। কিন্তু এ সম্পর্কে বিভিন্ন স্তরের দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গের সাথে পরামর্শের প্রয়োজন ছিল। নিথর নিস্তব্ধ গভীর অন্ধকারাচ্ছন্ন রাত্রিতে তাদের মাঝে কোন গুপ্তচর অবস্থান করে তাদের সিদ্ধান্ত জেনে নিতে পারে এমন আশংকাও ছিল। তাই আবূ সুফিয়ান এরূপ হুঁশিয়ারি প্রদান করলেন যে, কথাবার্তা আরম্ভ করার পূর্বে উপস্থিত জনমণ্ডলীর প্রত্যেকে যেন নিজের সম্মুখবর্তী লোককে চিনে নেয়—যাতে বহিরাগত কোন লোক আমাদের পরামর্শ শুনতে না পায়।

হযরত হোযায়ফা (রা) বলেন ঃ এখন আমি প্রমাদ গুণতে লাগালাম যে, যদি আমার সম্মুখবর্তী লোক আমার পরিচয় জিজ্ঞেস করে তবে হয়ত আমি ধরা পড়ে যাব। তাই তিনি অত্যন্ত বিচক্ষণতা ও সাহসিকতার সাথে নিজে অগ্রণী হয়ে নিজের

সম্মুখস্থ ব্যক্তির হাতের উপর হাত রেখে জিজ্ঞেস করলেন যে, তুমি কে? সে বলল, আশ্চর্য! তুমি আমাকে চিনতে পাচ্ছ না, আমি অমুকের ছেলে অমুক—সে হাওয়াযিন গোত্রের লোক ছিল। আল্লাহ্ পাক এভাবে হযরত হোযায়ফা (রা)-কে শত্রুর হাতে বন্দী হওয়া থেকে রক্ষা করলেন।

আবূ সুফিয়ান যখন এ সম্পর্কে স্থির নিশ্চিত হলেন যে, সমাবেশ তাদের নিজস্ব লোকদেরই—অপর কেউ নেই, তখন তিনি উদ্বেগজনক অবস্থাবলী, বনূ কোরায়যার বিশ্বাসঘাতকতা ও যুদ্ধ সামগ্রী নিঃশেষ হয়ে যাওয়া সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলী বিবৃত করে বললেন যে, আমার মতে এখন আমাদের সকলের ফিরে যাওয়া উচিত। আমিও ফিরে চল্‌ছি। একথা বলার সাথে সাথেই সৈন্যদের মাঝে পালাও পালাও রব পড়ে গেল এবং সবাই ফিরে চল্‌লো।

হযরত হোযায়ফা (রা) বলেন যে, আমি যখন এখান থেকে ফিরে রওয়ানা করলাম, তখন এমন মনে হচ্ছিল যেন আমার আশেপাশেই কোন গরম গোসলখানা আমাকে ঠাণ্ডা থেকে বাঁচিয়ে রাখছে। ফিরে গিয়ে হুযূর (সা)-কে নামাযরত দেখতে পেলাম। সালাম ফেরানোর পর আমি তাঁর নিকট সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করার পর তিনি আনন্দে হেসে ফেললেন। এমনকি রাতের আঁধারেও তাঁর দাঁতগুলো চমকে উঠছিল। অতপর রসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে তাঁর পায়ের দিকে স্থান করে দিয়ে তাঁর গায়ে জড়ানো চাদরের একাংশ আমার গায়ের উপর জড়িয়ে দিলেন। আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। যখন ভোর হয়ে গেল তখন তিনি আমাকে এই বলে সজাগ করলেন—قم يا نومان হে ঘুমকাতুরে উঠ!

আগামীতে কাফিরদের মনোবল ভেংগে যাওয়ার সুসংবাদ ঃ বুখারী শরীফে হযরত সুলায়মান বিন সারদ (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, আহযাব ফিরে যাওয়ার পর রসূলুল্লাহ্ (সা) ফরমান ঃ الآن نغزوهم ولا يغزوننا نحن نسير اليهم بخارى এখন থেকে আমরাই আক্রমণ চালাবো, ওরা আক্রমণ করতে আর সাহসী হবে না। অদূর ভবিষ্যতে আমরা তাদের দেশে পৌঁছে যাব এবং অধিকার প্রতিষ্ঠা করব। এরূপ ইরশাদ করার পর রসূলুল্লাহ্ (সা) সাহাবায়ে কিরাম (রা)-সহ মদীনায় ফিরে আসেন এবং সুদীর্ঘ একমাস পর তাঁরা নিরস্ত্র হন।

প্রণিধানযোগ্য বিষয় ঃ হযরত হোযায়ফা (রা)-সংশ্লিষ্ট এ ঘটনা মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে। ঘটনাটি বিশেষভাবে শিক্ষাপ্রদ।---নানাবিধ উপদেশাবলী এবং রসূলুল্লাহ্ (সা)-র বেশ কিছুসংখ্যক মু'জিযা এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। চিন্তাশীল সুধীবর্গ নিজে নিজেই তা অনুধাবন করে নিতে পারবেন---বিস্তারিতভাবে লেখার প্রয়োজন নেই।

বনূ কুরায়যার যুদ্ধ ঃ রসূলুল্লাহ্ (সা) এবং সাহাবায়ে কিরাম মদীনায় পৌঁছার পর পরই হঠাৎ করে জিবরাঈল (আ) হযরত দাহ্‌ইয়ায়ে কালবীর আকৃতি ধারণ করে

তশরীফ আনেন এবং বলেন যে, যদিও আপনারা অস্ত্র-শস্ত্র খুলে রেখে দিয়েছেন--- ফেরেশতাগণ কিন্তু তাদের অস্ত্র সংবরণ করেন নি। আল্লাহ্ পাক আপনাদেরকে বনী কোরায়যার উপর আক্রমণ করতে হুকুম করেছেন এবং আমি আপনাদের আগে আগে সেখানে যাচ্ছি।

রসূলুল্লাহ্ তাঁর এ নির্দেশ মদীনাবাসীদের মাঝে প্রচার করে দেওয়ার জন্য জনৈক সাহাবী (রা)-কে প্রেরণ করেন যে لا يصلين أحد ن العصر الا فى بنى قريظة অর্থাৎ কোরায়যা গোত্রে না পৌঁছে তোমাদের কেউ যেন আসরের নামায না পড়ে।

সমস্ত সাহাবায়ে কিরাম তৎক্ষণাৎ দ্বিতীয় জিহাদের জন্য প্রস্তুত হয়ে বনূ কোরায়যা অভিমুখে রওয়ানা করেন। রাস্তায় আসরের সময় হলে পর কিছু সংখ্যক সাহাবায়ে কিরাম নবীজীর বাহ্যিক নির্দেশ মুতাবিক আসরের নামায আদায় করলেন না বরং নির্দিষ্ট স্থল বনূ কোরায়যা পর্যন্ত পৌঁছে আদায় করলেন। আবার কতক সাহাবী এরূপ মনে করলেন যে, হুযূর (সা)-এর উদ্দেশ্য আসরের সময় থাকতে থাকতে বনূ কোরায়যা পৌঁছে যাওয়া। সুতরাং আমরা যদি পথে নামায আদায় করে আসরের সময় থাকতে থাকতেই সেখানে পৌঁছে যাই তবে হুযূরের হুকুম অমান্য করা হবে না। তাই তারা আসরের নামায যথাসময়ে পথিমধ্যেই আদায় করে নিলেন।

পরস্পর বিরোধী মত পোষণকারীর কোন পক্ষই দোষী নয় বলে কেউই ভর্ৎসনা পাওয়ার যোগ্য নন ঃ রসূলুল্লাহ্ (সা) সাহাবায়ে কিরামের এই বিপরীতমুখী কার্যক্রম গ্রহণ সম্পর্কে অবহিত হওয়ার পর কোন পক্ষকেও ভর্ৎসনা করেন নি। উভয় পক্ষই সঠিক পন্থী বলে সাব্যস্ত করেন। তাই বিশিষ্ট উলামায়ে কিরাম এই মূলনীতি বের করেছেন যে, যাঁরা প্রকৃত মুজতাহিদ এবং যাঁদের ইজতিহাদের সত্যিকার যোগ্যতা রয়েছে তাঁদের বিপরীতমুখী মতামতের কোনটাই ভ্রান্ত ও অপকৃষ্ট বলে মন্তব্য করা চলে না। উভয় পক্ষই নিজ নিজ ইজতিহাদানুযায়ী কাজ করলেও সওয়াবের অধিকারী হবেন।

বনূ কুরায়যার উদ্দেশ্যে জিহাদের জন্য বের হওয়ার কালে রসূলুল্লাহ্ (সা) পতাকা হযরত আলী (রা)-কে প্রদান করেন। বনূ কুরায়যা রসূলুল্লাহ্ (সা) ও সাহাবায়ে কিরামের আগমন সংবাদ পেয়ে সুরক্ষিত দুর্গে আশ্রয় নেয়। মুসলিম বাহিনী এ দুর্গ অবরোধ করেন।

কুরায়যা গোত্রপতি কা'বের বক্তৃতা ঃ কুরায়যা গোত্রপতি কা'ব---যে নবীজীর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে আহযাবের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিল---সেই পরিপ্রেক্ষিতে গোত্রের সম্মুখে অবস্থার নাজুকতা বর্ণনার পর তিন প্রকারের কার্যক্রম পেশ করে ঃ

(১) তোমরা সকলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র অনুসারী হয়ে যাও। কেননা আমি শপথ করে বলতে পারি যে, তিনি (সা) সত্য নবী---যা তোমরাও

জান এবং তোমাদের ধর্মীয় গ্রন্থ তওরাতেও সে সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে, তোমরা নিজেরাও তা পাঠ করেছ। যদি তোমরা এমন কর তবে ইহজগতে নিজেদের ধন-প্রাণ ও সন্তান-সন্ততিদেরকে রক্ষা করতে পারবে এবং তোমাদের পরকালও শুভ ও শান্তিময় হবে।

(২) অথবা তোমরা নিজেদের পুত্র-পরিজন ও স্ত্রীগণকে নিজ হাতে হত্যা করে বীর বিক্রমে যুদ্ধ করার পর নিজেদের প্রাণ বিসর্জন দাও।

(৩) তৃতীয় পথ এই যে, শনিবার মুসলমানদের উপর অতর্কিতভাবে আক্রমণ কর। কেননা মুসলমানগণ জানে যে, আমাদের ধর্মে শনিবার যুদ্ধ-বিগ্রহ নিষিদ্ধ। তাই তারা সে দিন আমাদের সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাকবে। আমরা অতর্কিতভাবে আক্রমণ করলে জয় লাভের সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে।

গোত্রপতি কা'বের এ বক্তৃতার পর গোত্রের সমস্ত লোক জবাবে বলল যে, প্রথম প্রস্তাব---অর্থাৎ মুসলমান হয়ে যাওয়ার কথা কল্পনাও করা যায় না। কেননা আমরা তওরাত ছেড়ে দিয়ে অন্য কোন গ্রন্থের উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে পারি না। এখন রইল দ্বিতীয় প্রস্তাব, নারী ও শিশুরা কি অপরাধ করেছে যে আমরা তাদেরকে হত্যা করব! অবশিষ্ট তৃতীয় প্রস্তাব সম্পর্কে কথা হল--ইহা স্বয়ং তওরাতের হুকুম ও আমাদের ধর্ম-বিশ্বাসের পরিপন্থী। তাই এটাও আমরা করতে পারি না।

অতপর সকলে এ ব্যাপারে একমত হল যে, রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সামনে অস্ত্র ছেড়ে দিয়ে তিনি যা করেন তাতেই রাযী থাকব। আনসারদের মধ্যে যাঁরা আউস গোত্রভুক্ত ছিলেন---তাঁরা প্রাচীন কাল থেকেই বনূ কোরায়যার সাথে একটা মৈত্রীচুক্তিতে আবদ্ধ ছিলেন। তাই আউস গোত্রভুক্ত সাহাবায়ে কিরাম হুযূর (সা)-এর খিদমতে আরয করলেন যে, তাদেরকে আমাদের দায়িত্বে ছেড়ে দিন। রসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করলেন যে, তোমাদের ব্যাপার তোমাদেরই এক নেতার উপর ন্যস্ত করতে চাচ্ছি। তোমরা এতে রাযী আছ কি-না? তারা এতে রাযী হয়ে গেলে পর নবীজী বললেন যে, তোমাদের সে নেতা সা'আদ বিন মুয়ায---এর মীমাংসার ভার আমি তাঁর উপর ন্যস্ত করছি। এ প্রস্তাবে সবাই সম্মতি জানালো।

খন্দকের যুদ্ধে হযরত সা'আদ বিন মুয়ায (রা) বিশেষভাবে ক্ষত-বিক্ষত হন। তাঁর সেবা-যত্নের জন্য রসূলুল্লাহ্ (সা) মসজিদে নববীর গণ্ডীতেই তাঁবু টানিয়ে দেন। রসূলুল্লাহ্ (সা)-র নির্দেশ মুতাবিক বনূ কোরায়যাভুক্ত কয়েদীদের মীমাংসার ভার হযরত সা'আদ বিন মুয়াযের উপর ছেড়ে দেওয়া হয়। তিনি এদের মধ্যে যারা যুবক যোদ্ধা রয়েছে, তাদেরকে হত্যা করে দেওয়ার এবং নারী, শিশু ও বৃদ্ধদেরকে যুদ্ধবন্দীর মর্যাদা দেওয়ার রায় প্রদান করেন। ফলে এ সিদ্ধান্তই কার্যকর করা হয়। এ রায় দেওয়ার অব্যবহিত পরেই হযরত সা'আদ (রা)-এর ক্ষত থেকে রক্ত প্রবাহিত হতে লাগল এবং এর ফলেই তিনি পরলোক গমন করেন। আল্লাহ্ পাক তাঁর তিনটি দোয়াই কবূল করেছেন। প্রথমত আগামীতে কুরায়শ আর যেন রসূলুল্লাহ্ (সা)-র উপর আক্রমণ

করতে সাহস না পায়। দ্বিতীয়ত বনূ কুরায়যা নিজেদের বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি যেন পেয়ে যায় যা আল্লাহ্ পাক তাঁর মাধ্যমেই বাস্তবায়িত করেন। তৃতীয়ত তিনি শহীদের মৃত্যু বরণ করেন।

যাদেরকে হত্যা করা সাব্যস্ত হলো তাদের মধ্যে কেউ কেউ মুসলমান হয়ে যাওয়ায় তাদেরকে মুক্তি দেওয়া হলো। প্রসিদ্ধ সাহাবী আতিয়া কুরাযী (রা)-ও এঁদের অন্যতম। হযরত যুবায়ের বিন বাতাও এঁদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। হযরত সাবেত বিন কায়েস (রা) আঁ হযরত (সা)-এর নিকট দরখাস্ত করে এদেরকে মুক্তির ব্যবস্থা করেন। এর কারণ এই যে, অন্ধকার যুগে যুবায়ের বিন বাতা তার প্রতি এক বিশেষ অনুগ্রহ প্রদর্শন করেছিল। তা এই যে, অন্ধকার যুগে বুয়াসের যুদ্ধে হযরত সাবেত বিন কায়েস (রা) যুবায়ের বিন বাতার হাতে বন্দী হন। যুবায়ের তাঁকে হত্যা না করে তার মাথার চুল কেটে মুক্ত করে দেয়।

অনুগ্রহের প্রতিদান এবং জাতীয় মর্যাদাবোধের দুটি অনন্য ও বিস্ময়কর উদাহরণঃ হযরত সাবেত বিন কায়েস যুবায়ের বিন বাতার মুক্তির নির্দেশ লাভ করে তার নিকট গিয়ে বললেন যে, তুমি বুয়াসের যুদ্ধে আমার প্রতি যে অনুগ্রহ প্রদর্শন করেছিলে তারই প্রতিদান হিসাবে তোমার এই মুক্তির ব্যবস্থা করলাম। যুবায়ের বলল যে, সম্ভ্রান্তজন অপর সম্ভ্রান্তজনের প্রতি এরূপ ব্যবহারই করে থাকে। কিন্তু একথা বল দেখি যে, যে ব্যক্তির পরিবার-পরিজন বেঁচে থাকবে না, তার বেঁচে থাকার সার্থকতা কি? একথা শুনে হযরত সাবেত বিন্ কায়েস হুযূর (সা)-এর খিদমতে গিয়ে তার পরিবার-পরিজনকেও মুক্ত করে দেবার আবেদন করলেন। তিনিও তা গ্রহণ করলেন। যুবায়ের আরো এক ধাপ অগ্রসর হয়ে বলল যে, পরিবার-পরিজন বিশিষ্ট কোন মানুষ তার ধনসম্পদ ব্যতীত কিভাবে বেঁচে থাকতে পারে। সাবেত বিন্ কায়েস পুনরায় হযরত নবী করীম (সা)-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে তার ধনসম্পদও ফেরত দেওয়ার আবেদন করলেন। এটাই ছিল একজন মু'মিনের শালীনতা ও কৃতজ্ঞতাবোধের উদাহরণ—হযরত সাবেত বিন্ কায়েস (রা) তা প্রদর্শন করেছিলেন।

অতপর যখন যুবায়ের বিন্ বাতা স্বীয় পরিবার-পরিজন ও ধনসম্পদ ফেরত প্রাপ্তি সম্পর্কে নিশ্চিত হল তখন সে হযরত সাবেত বিন্ কায়েস (রা)-এর নিকট ইহুদী সম্প্রদায়ের বিভিন্ন নেতৃবৃন্দের পরিণতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করে বলল যে, চীনা দর্পণের ন্যায় উজ্জ্বল ও সাদা মুখমণ্ডল বিশিষ্ট ইবনে আবিল হকায়েক, কোরায়যা গোত্রপতি কা'ব বিন কুরায়যা ও আমর বিন কুরায়যার অবস্থা কি? উত্তরে বললেন যে, তাদের সবাইকে হত্যা করে দেওয়া হয়েছে। অতপর আরো দুটি দল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করায় তাদেরকেও হত্যা করে ফেলা হয়েছে বলে সংবাদ দেওয়া হলো।

একথা শুনে যুবায়ের বিন্ বাতা হযরত সাবেত বিন্ কায়েস (রা)-কে বলল যে, আপনি আমার অনুগ্রহের প্রতিদান পূর্ণভাবে আদায় করেছেন এবং নিজ দায়িত্ব পুরোপুরিই পালন করেছেন। কিন্তু এসব লোকদের অন্তর্ধানের পর আমি আমার বিষয়াময়

জমাজমি আবাদ করব না। আমাকেও হত্যা করে তাদেরই দলভুক্ত করে দেন। হযরত সাবেত (রা) তাকে হত্যা করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলেন। অবশ্য তার পীড়াপীড়িতে অপর এক মুসলমান তাকে হত্যা করে ফেলে।---(কুরতুবী)

এটাই ছিল জনৈক কাফিরের জাতীয় অনুভূতি ও আত্মমর্যাদাবোধ---যে সকল কিছু ফিরে পাওয়ার পরও নিজের সঙ্গীহারা অবস্থায় বেঁচে থাকা পছন্দ করল না। একজন মু'মিন ও একজন কাফিরের এরূপ কর্মকাণ্ড এক ঐতিহাসিক স্মারক রূপে বিদ্যমান থাকবে।

বনূ কুরায়যার বিরুদ্ধে এ বিজয় পঞ্চম হিজরীতে যিলকদ মাসের শেষে ও যিলহজ্জ মাসের প্রথম ভাগে অনুষ্ঠিত হয়।---(কুরতুবী)

প্রণিধানযোগ্য বিষয়ঃ আহযাব (সম্মিলিত বাহিনী) ও বনূ কুরায়যার যুদ্ধদ্বয়কে এখানে খানিকটা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করার এক কারণ এই যে, স্বয়ং কোরআনেও এর সবিস্তার বর্ণনা দু'রুকূ ব্যাপী স্থান দখল করে আছে। দ্বিতীয় কারণ এর মধ্যে মানব জীবনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কেও নানাবিধ উপদেশমালা, রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সুস্পষ্ট মু'জিযাসহ আরো বহু শিক্ষাপ্রদ বিষয় রয়েছে। যেগুলোকে এ কাহিনীর মধ্য দিয়ে বিভিন্ন শিরোনামায় বর্ণনা করা হয়েছে। এ সম্পূর্ণ ঘটনা অবহিত হওয়ার পর উল্লিখিত আয়াতসমূহের ব্যাখ্যার জন্য তফসীরের সার-সংক্ষেপ দেখে নেওয়াই যথেষ্ট---অতিরিক্ত বিশ্লেষণ নিষ্প্রয়োজন। অবশ্য কয়েকটি কথা প্রণিধানযোগ্য।

(১) এই যুদ্ধে মুসলমানদের কঠিন বিপদ ও দুঃখ-কষ্টে পতিত হওয়ার কথা বর্ণনা করে এ দুর্যোগপূর্ণ বিশ্বে মুসলমানদের এক অবস্থা এরূপভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যেঃ وَتَظُنُّونَ بِاللّٰهِ الظُّنُونَا ---অর্থাৎ আল্লাহ্ পাক সম্পর্কে তোমরা বিভিন্ন ধারণা পোষণ করছিলে। এসব ধারণা দ্বারা সেসব ইচ্ছা বহির্ভূত ধারণাসমূহকেই বোঝানো হয়েছে---যেগুলো সঙ্কটকালে মানব মনে উদয় হয়---যেমন মৃত্যু আসন্ন ও অনিবার্য, বাঁচার আর কোন উপায় নেই ইত্যাদি। এরূপ ইচ্ছাবহির্ভূত ধারণা ও কল্পনাসমূহ পরিপক্ক ঈমান বা পরিপূর্ণ নির্ভরশীলতার পরিপন্থী নয়। অবশ্য এগুলো চরম দুর্বিপাক ও কঠিন বিপদের পরিচায়ক ও সাক্ষ্যবাহক। কেননা পর্বতবৎ অনড় ও দৃঢ়পদ সাহাবায়ে কিরামের অন্তরেও এ ধরনের দুর্বলতা সৃষ্টি হয়েছে।

(২) মুনাফিকদের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, তারা প্রকাশ্যভাবে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের অঙ্গীকারসমূহকে ভাওতা ও প্রতারণা বলে আখ্যায়িত করতে লাগল ঃ

إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ

وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا যখন কপট বিশ্বাসী এবং ব্যাধিগ্রস্ত অন্তর বিশিষ্ট লোকেরা বলতে লাগল যে, আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের এসব অঙ্গীকার প্রতিশ্রুতি প্রতারণা বৈ কিছুই নয়। এ তো ছিল তাদের অভ্যন্তরীণ কুফরীর বহিঃপ্রকাশ। পরবর্তী পর্যায়ে যেসব মুনাফিক কার্যত---বাহ্যিকভাবে মুসলমানদের সাথে যুদ্ধে শরীক ছিল তাদের দু'শ্রেণীর বর্ণনা রয়েছে। প্রথম শ্রেণী---যারা কিছু না বলেই পালাতে লাগল---যারা বলতে লাগল ঃ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا --- অর্থাৎ হে ইয়াসরিববাসীগণ! তোমাদের টিকে থাকার উপায় নেই সুতরাং ফিরে চল। আর অপর শ্রেণী যারা ছল-চাতুরী বের করে হযরত (সা)-এর নিকট ফিরে যাওয়ার আবেদন করল। যাদের অবস্থা এরূপভাবে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ (অর্থাৎ এদের মাঝে একদল নবীজীর নিকট এই বলে ফিরে যাওয়ার অনুমতি চাইতে লাগল যে, আমাদের বাড়ি অরক্ষিত অবস্থায় রয়েছে।) কোরআন করীম এদের ছল-চাতুরীর স্বরূপ উদঘাটন করে দিয়েছে যে, এসব কিছু মিথ্যা ---আসলে এরা যুদ্ধের ময়দান থেকে পালিয়ে যেতে চায়, - إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا পরবর্তী কয়েক আয়াতে এদের কু-কীর্তি ও অপকৃষ্টতা এবং মুসলমানদের সাথে এদের শত্রুতা, অতপর এদের করুণ ও মর্মন্তুদ পরিণতির বর্ণনা রয়েছে।

এরপর অকপট ও খাঁটি মুসলিমগণের বর্ণনা প্রসংগে এদের অসম দৃঢ়তার প্রশংসা করা হয়েছে। এরই প্রেক্ষিতে রসূলুল্লাহ্ (সা) অনুসরণ ও অনুকরণের প্রয়োজনীয়তা ও অপরিহার্যতা এক মূলনীতিরূপে বর্ণনা করা হয়েছে।—لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ (অর্থাৎ নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য রসূলুল্লাহ্ (সা)-র মধ্যে উত্তম---অনুপম আদর্শ রয়েছে।) এ দ্বারা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র বাণীসমূহ ও কার্যাবলী উভয়ই অনুসরণের হুকুম রয়েছে বলে প্রমাণিত হয়। কিন্তু বিশিষ্ট মুফাস্সিরগণের মতে এর বাস্তব ও কার্যকরী রূপ এই যে, যেসব কাজ করা বা পরিহার করা সম্পর্কে রসূলুল্লাহ্ (সা) দ্বারা অবশ্য করণীয় স্তর পর্যন্ত পৌঁছেছে বলে প্রমাণিত, তা অনুসরণ ওয়াজিব ও অপরিহার্য। আর যেগুলো করা বা বর্জন করা উত্তম (মুস্তাহাব) হওয়ার স্তর পর্যন্ত পৌঁছেছে তা করা বা বর্জন করা আমাদের ক্ষেত্রেও মুস্তাহাবের স্তরেই থাকবে।---তা অমান্য করা অপরাধ বলে গণ্য হবে না।

উল্লিখিত আয়াতসমূহের সর্বশেষ তিন আয়াতে বনূ কুরায়যার ঘটনা বিবৃত হয়েছে। — وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِن صَيَاصِيهِمْ

অর্থাৎ যে সকল আহ্‌লে কিতাব সম্মিলিত শত্রু বাহিনীর সহযোগিতা করেছে আল্লাহ্ পাক তাদের অন্তরে রসূলুল্লাহ্ (সা) ও সাহাবায়ে কিরামের প্রতি ভীতি সঞ্চার করে তাদেরকে তাদের সুরক্ষিত দুর্গ থেকে নীচে নামিয়ে দেন এবং তাদের ধনসম্পদ ও ঘরবাড়ি মুসলমানগণের স্বত্বভুক্ত করে দেন।

সর্বশেষ আয়াতে মুসলমানদের অদূর ভবিষ্যতে জয়যাত্রার সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে যে, এখন থেকে কাফিরদের অগ্রাভিযানের অবসান এবং মুসলমানদের বিজয় যুগের সূচনা হলো আর এমন সব ভূখণ্ড তাদের অধিকারভুক্ত হবে যেগুলোর উপর কখনো তাদের পদচারণা পর্যন্ত হয়নি, যার বাস্তবায়ন সাহাবায়ে কিরামের যুগে বিশ্বমানব প্রত্যক্ষ করেছে। পারস্য ও রোমান সাম্রাজ্যের এক বিশাল ও সুবিস্তীর্ণ অঞ্চল তাঁদের অধিকারভুক্ত হয়। আল্লাহ্ পাক যা চান তাই করেন।

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا
وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٢٨﴾ وَإِن كُنتُنَّ
تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ
مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٢٩﴾ يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ
مُّبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ ۚ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿٣٠﴾
وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُّؤْتِهَا أَجْرَهَا
مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا ﴿٣١﴾ يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ
مِّنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي
قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿٣٢﴾ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ
تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ

وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ
وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ
اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ﴿٣٤﴾

(২৮) হে নবী! আপনার পত্নীগণকে বলুন, তোমরা যদি পার্থিব জীবন ও তার বিলাসিতা কামনা কর, তবে আস, আমি তোমাদের ভোগের ব্যবস্থা করে দেই এবং উত্তম পন্থায় তোমাদেরকে বিদায় দেই। (২৯) পক্ষান্তরে যদি আল্লাহ্, তাঁর রসূল ও পরকাল কামনা কর, তবে তোমাদের সৎকর্মপরায়ণদের জন্য আল্লাহ্ মহা পুরস্কার প্রস্তুত করে রেখেছেন। (৩০) হে নবী-পত্নীগণ,! তোমাদের মধ্যে কেউ প্রকাশ্যে অশ্লীল কাজ করলে তাকে দ্বিগুণ শাস্তি দেয়া হবে। এটা আল্লাহ্র জন্যে সহজ। (৩১) তোমাদের মধ্যে যে কেউ আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের অনুগত হবে এবং সৎকর্ম করবে, আমি তাকে দু'বার পুরস্কার দেব এবং তাঁর জন্য আমি সম্মানজনক রিযিক প্রস্তুত রেখেছি। (৩২) হে নবী-পত্নীগণ! তোমরা অন্য নারীদের মত নও; যদি তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর, তবে পরপুরুষের সাথে কোমল ও আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে কথা বলো না, ফলে সেই ব্যক্তি কুবাসনা করে, যার অন্তরে ব্যাধি রয়েছে। তোমরা সঙ্গত কথা-বার্তা বলবে। (৩৩) তোমরা গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান করবে--মূর্খতাযুগের অনুরূপ নিজে-দেরকে প্রদর্শন করবে না, নামায কায়েম করবে, যাকাত প্রদান করবে এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করবে। হে নবী-পরিবারের সদস্যবর্গ! আল্লাহ্ কেবল চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে পূর্ণরূপে পূত-পবিত্র রাখতে। (৩৪) আল্লাহ্র আয়াত ও জ্ঞানগর্ভ কথা, যা তোমাদের গৃহে পঠিত হয় তোমরা সেগুলো স্মরণ করবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ সূক্ষ্মদর্শী, সর্ববিষয়ে খবর রাখেন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

হে নবী (সা)! আপনি আপনার পত্নীগণকে (রা) বলে দিন---(তোমাদের সামনে দু'টো স্পষ্ট কথা পেশ করা হচ্ছে---সে কথা দু'টো এই যে,) যদি তোমরা পার্থিব জীবনের (সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য) এবং তার জৌলুস ও চাকচিক্য কামনা কর তবে আস (অর্থাৎ তা গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত হও) আমি তোমাদেরকে কিছু (পার্থিব) ধনসম্পদ প্রদান করব (অথবা এর অর্থ সেই যুগল বস্ত্র যা তালাকপ্রাপ্তা পত্নীকে তালাকের পর প্রদান করা মুস্তাহাব বা এর অর্থ স্ত্রীর ইদ্দত পালনকালীন খোরপোষ উভয়ই এর অন্ত-র্ভুক্ত) এবং (সে সম্পদ প্রদান করে) তোমাদেরকে অত্যন্ত শালীনতার সাথে বিদায় করব (অর্থাৎ সুন্নত অনুসারে তালাক দিয়ে দেব, যাতে যেখানে চাও গিয়ে পার্থিব সম্পদ লাভ করতে পার) আর যদি তোমরা আল্লাহ্কে পেতে চাও এবং (এখানে

আল্লাহ্‌কে পেতে চাওয়ার অর্থ) তাঁর রসূল (সা)-কে (চাও অর্থাৎ বর্তমান দীন-হীন দারিদ্র্য পীড়িত অবস্থা বরণ করে রসূল (সা)-এরই পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ থাকতে চাও) এবং পরকালের (সুউচ্চ মর্যাদাসমূহ) লাভ করতে চাও (যা নবীজীর সাথে পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ থাকার পরিপ্রেক্ষিতে লাভ করা যাবে) তবে (এটা তোমাদের সদাচার ও সৎস্বভাবের পরিচায়ক। এবং) তোমাদের সৎস্বভাব বিশিষ্ট পুণ্যবতীগণের জন্য আল্লাহ্ পাক (পরকালে) বিশেষ প্রতিদান ও পারিতোষিক প্রস্তুত করে রেখেছেন। (অর্থাৎ এটা ঐ প্রতিদান যা নবী-পত্নীগণের জন্য নির্দিষ্ট যা অন্যান্য নারীগণের প্রতিদান হতে উন্নততর এবং নবীজীর সাথে দাম্পত্যসূত্রে আবদ্ধ না থাকলে তা থেকে বঞ্চিত হবে। যদিও সাধারণ দলীলাদি দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, এমতাবস্থাতেও ঈমান ও সৎকর্মসমূহের প্রতিফল লাভ করবে। এ পর্যন্ত তো ইচ্ছা প্রদর্শন সংশ্লিষ্ট বিষয়, যে ক্ষেত্রে রসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর পুণ্যবতী স্ত্রীগণকে এ স্বাধীনতা প্রদান করেছেন যে বর্তমান অবস্থার উপর তুষ্ট থেকে তাঁর সাথে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ থাকাকেই পছন্দ করে নিক অথবা তালাক গ্রহণ করুক। পরবর্তী পর্যায়ে আল্লাহ্ তা'আলা দাম্পত্যসূত্রে আবদ্ধ থাকার পরিপ্রেক্ষিতে যেসব নির্দেশ অবশ্য পালনীয় সেগুলো বর্ণনা করেছেন। ইরশাদ হচ্ছেঃ) হে নবী-পত্নীগণ! তোমাদের মধ্য হতে যে অশ্লীল আচরণ প্রদর্শন করবে [অর্থাৎ এমন আচরণ যদ্দ্বারা নবীজী (সা) অতিষ্ঠ উদ্বেগাকুল হয়ে উঠেন। তবে] তাদেরকে (এ কারণে পরকালে) দ্বিগুণ শাস্তি প্রদান করা হবে। (অর্থাৎ অন্যান্য নারীগণ স্বামীর সাথে মন্দ আচরণের ফলে যে পরিমাণ শাস্তি ভোগ করতো তার দ্বিগুণ শাস্তি ভোগ করবে) এবং একথা আল্লাহ্ পাকের পক্ষে (একেবারে) সহজ (এমনটি নয় যে, দুনিয়ার শাসকবর্গের ন্যায় পর্যায়ক্রমে শাস্তি বৃদ্ধি করার পথে কারো পদমর্যাদা প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে।) আর তোমাদের মাঝে যারা আল্লাহ্ পাক ও তাঁর রসূলের অনুসরণ করবে (অর্থাৎ যে সব কাজ আল্লাহ্ পাক অবশ্য করণীয় করে দিয়েছেন তা পালন করবে ও স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ (সা) স্বামী হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে তাদের উপর যে অতিরিক্ত কর্তব্য ও দায়িত্ব আরোপিত হয় তা পালন করে) এবং (অবশ্য করণীয় কর্মসমূহের বাইরে যে) সৎকাজসমূহ (রয়েছে, তা) করবে তবে আমি তার সওয়াবও দ্বিগুণ করে দেব এবং আমি তাদের জন্য (এই প্রতিশ্রুত দ্বিগুণ প্রতিদান ছাড়াও) এক (বিশেষ) উত্তম খাবার (যা নবী-পত্নীগণের জন্য নির্দিষ্ট থাকবে এবং যা কর্মফলের অতিরিক্ত হবে) প্রস্তুত করে রেখেছি। (আনুগত্যের দরুন দ্বিগুণ পুরস্কার ও প্রতিফল এবং আনুগত্যহীনতার জন্য তদ্রূপ দ্বিগুণ শাস্তির কারণ নবীজীর সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ থাকার সৌভাগ্য লাভ ---যে কথা

يٰنِسَآءَ النَّبِيِّ الخ আয়াত দ্বারা প্রকাশ পাচ্ছে। কেননা বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের

ত্রুটি-বিচ্যুতি সাধারণ লোকের ত্রুটির চাইতে অধিক আপত্তিকর ও শাস্তিযোগ্য

বলে বিবেচিত হয়। অনুরূপভাবে তাদের আনুগত্যও সাধারণ লোকের আনুগত্যের চাইতে অধিক প্রশংসনীয় ও অধিক পুরস্কার লাভের যোগ্য। সুতরাং পুরস্কার ও তিরস্কার, শাস্তি ও শাস্তি উভয় ক্ষেত্রে তারা সাধারণ লোকের চাইতে বিশিষ্ট মর্যাদা ও স্বাতন্ত্র্যের দাবীদার। আর বিশেষ করে প্রসংগত একথাও বলা চলে, উম্মাহাতুল মু'মিনীনের (মু'মিনকুলের মহীয়সী মাতৃবর্গ) খিদমত ও আনুগত্য প্রদর্শন নবীজী (সা)-র অন্তরতুষ্টি ও শান্তি বৃদ্ধির বিশেষ সহায়ক হবে। সুতরাং তাঁর (সা) তৃপ্তি ও তুষ্টি সাধন অধিক প্রতিদান ও পুরস্কার লাভের কারণ হবে। অপরপক্ষে এর বিপরীত দিকটাও অনুরূপই মনে করতে হবে। এ পর্যন্ত পুণ্যবতী স্ত্রী (রা)-গণের প্রতি তাঁর (সা) অধিকার সম্পর্কিত বিষয়ের বর্ণনা ছিল। পরবর্তী পর্যায়ে অধিক গুরুত্ব আরোপের উদ্দেশ্যে সাধারণ হুকুমাবলী সম্পর্কিত সম্বোধন তা এই যে) হে নবী-পত্নীগণ! (তোমরা নিছক এ কারণে যেন গর্বস্ফীত ও উল্লসিত না হও যে, তোমরা নবীর অর্ধাঙ্গিনী—সুতরাং সাধারণ স্ত্রীকুলের চাইতে বিশিষ্ট মর্যাদা ও স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী এবং এ সম্পর্ক ও মর্যাদাই তোমাদের জন্য যথেষ্ট। তাই এরূপ ধারণা যেন পোষণ না কর। একথা ঠিক যে) তোমরা অপরাপর সাধারণ স্ত্রীলোকদের ন্যায় নও (নিঃসন্দেহে তাদের চাইতে তোমরা বিশিষ্ট মর্যাদার অধিকারী। কিন্তু তা শুধু এমনিতেই নয়; বরং এর সাথে একটি শর্তও জড়িত রয়েছে। তা এই যে) যদি তোমরা তাকওয়া অবলম্বন কর (তবে তো তোমরা এ সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে প্রকৃতপক্ষেই অন্যান্যদের চাইতে অধিক মর্যাদার অধিকারিণী হবে ও শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করবে। এমনকি দ্বিগুণ সওয়াব অর্জন করবে। পক্ষান্তরে যদি এ শর্ত প্রতিফলিত না হয় তবে এ শর্তই দ্বিগুণ শাস্তির কারণ হয়ে দাঁড়াবে। যখন তাকওয়াহীন আত্মীয়তার সম্পর্ক সম্পূর্ণ মূল্যহীন) তখন (তোমাদের পক্ষে সাধারণভাবে শরীয়তের যাবতীয় আহকাম এবং বিশেষভাবে পরবর্তী আয়াতসমূহ বর্ণিত আহকামের অনুসরণ একান্ত বাঞ্ছনীয়। আর সেসব আহকাম এই যে,) তোমরা (গায়রে মুহরম পুরুষের সাথে) কথা-বার্তা বলতে গিয়ে (যখন তা বলার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়) কোমলতার আশ্রয় গ্রহণ করো না। (এর অর্থ এটা নয় যে ইচ্ছাকৃতভাবে কোমলতার আশ্রয় নিও না; কেননা এটা যে গর্হিত তা একেবারে সুস্পষ্ট। নবীজী (সা)-র শুদ্ধচারিণী স্ত্রীগণের পক্ষে এরূপ হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। বরং অর্থ এই যে, যেমন করে নারীগণের স্বভাবগত ভংগী কোমল ও বিনম্রভাবে কথা-বার্তা বলা, তোমরা এরূপ ভংগী ও নীতির অনুসরণ করো না) কেননা (এর ফলে) এমন সব লোকের মনে (ভ্রান্ত) ধারণার উদ্রেক করতে থাকে—যাদের অন্তঃকরণ কলুষতাপূর্ণ এবং অসৎ; বরং এক্ষেত্রে কৃত্রিমভাবে এই স্বাভাবিক ভংগী পরিবর্তন করে কথাবার্তা বল এবং নীতি পবিত্রতা মোয়াফেক কথা-বার্তা বল (অর্থাৎ এমন ভংগীতে যা হবে অপেক্ষাকৃত কর্কশ যা সতীত্ব রক্ষায় সহায়ক—এবং ইহা অসদাচরণ রূপে গণ্য নয়। অসদাচরণ ওটাই যাতে অন্তর ব্যথিত হয়। অশ্লীল কামনা ও ঘৃণ্য লালসা প্রতিহত করাকে কষ্ট দেওয়া বলা হয় না। এতে তো কেবল কথা বলা সম্পর্কে হুকুম করা হয়েছে।) এবং (পরবর্তী পর্যায়ে পর্দা সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে আর উভয়ের মধ্যে সাধারণ বিষয় হল—

সতীত্ব ও শুদ্ধাচারিতা। অর্থাৎ) তোমরা নিজ বাড়ীর মধ্যেই অবস্থান করতে থাক (অর্থাৎ---কেবল শালীন পোশাক পরিধান করাই পর্দার জন্য যথেষ্ট মনে করো না; বরং পর্দা এরূপভাবে কর, যাতে শরীর বা পোশাক-পরিচ্ছদ কোনটাই দৃষ্টিগোচর না হয়। যেমন পর্দার যে পদ্ধতি অধুনা ও সম্ভ্রান্ত পরিবারসমূহে প্রচলিত আছে যে, স্ত্রীলোকগণ বাড়ী থেকেই বের হয় না। অবশ্য প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে বাইরে বের হওয়ার কথা অন্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত।) এবং (পরবর্তী পর্যায়ে এ হুকুমেরই তাকীদের জন্য ইরশাদ হয়েছে যে,) প্রাচীন বর্বর যুগের রীতি মাফিক ঘোরাফেরা করো না (সে সময় পর্দার প্রচলন ছিল না---হোক না তা অশ্লীলতা বিবর্জিত। প্রাচীন বর্বর যুগের দ্বারা ইসলাম পূর্ববর্তী বর্বর যুগকে বোঝানো হয়েছে। এর মুকাবিলায় পরবর্তী এক বর্বরতাও আছে---তা হলো আহকামে ইসলামের প্রচার ও প্রসারের পরও তার উপর আমল না করা। সুতরাং ইসলাম-পরবর্তীকালীন বর্বরতা উত্তরকালীন বর্বরতা বলে গণ্য হবে। তাই উপমাচ্ছলে পূর্বকালীন বর্বরতা বিশেষভাবে উল্লেখের কারণ সুস্পষ্ট। এর মর্মার্থ এই যে, উত্তরকালীন বর্বরতা চালু করে পূর্ববর্তী বর্বরতার অনুসরণ করো না---যেগুলোর মূলোৎপাটিত করার জন্য ইসলামের আবির্ভাব। এ পর্যন্ত ছিল সতীত্ব ও শুদ্ধাচারিতা বিষয়ক আহকাম।) আর (সামনে শরীয়তের অন্যান্য আহকাম সম্পর্কে ইরশাদ হচ্ছে যে,) তোমরা নামায প্রতিষ্ঠা করবে এবং যাকাত আদায় করবে (যদি তোমরা নিসাবের অধিকারী হও। কেননা উভয়টাই ইসলামের বিশিষ্ট রুকন। তাই এ দু'টোকে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে) এবং (তোমাদের জ্ঞাত অন্যান্য যেসব হুকুম রয়েছে সেসব ক্ষেত্রে) আল্লাহ্ পাক ও তাঁর রসূলের কথা মেনে চল। (আর আমি যে তোমাদের উপর এসব আহকাম পালন ও অনুসরণে দায়িত্ব আরোপ করেছি তা তোমাদের কল্যাণ ও মঙ্গলার্থেই। কেননা) আল্লাহ্ পাকের (শরীয়তানুযায়ী এসব নির্দেশ প্রদানের) উদ্দেশ্য (হে পয়গম্বরের) পরিবার-পরিজন তোমাদের থেকে (পাপ-পঙ্কিলতা ও অবাধ্যতার) আবিলতা দূরে সরিয়ে রাখা এবং তোমাদেরকে (বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ, আমল-আকীদা ও চরিত্রগতভাবে সম্পূর্ণ) পূত-পবিত্র রাখা (কেননা বিরুদ্ধাচরণ পবিত্রতা অর্জনের পরিপন্থী এবং আবিলতা ও পঙ্কিলতার কারণ, এ থেকে বেঁচে থাকা আহ্কাম সম্পর্কিত জ্ঞানের মাধ্যমেই সম্ভব) এবং (যেহেতু এসব আহ্কামের উপর আমল করা ওয়াজিব এবং আমল-আহকাম সম্পর্কিত জ্ঞান আর তা স্মরণ রাখার উপর নির্ভশীল সুতরাং) তোমরা আল্লাহ্ পাকের এসব আয়াতসমূহ (অর্থাৎ কোরআন) এবং (আহ্কাম সম্পর্কিত) যে ইলমের চর্চা তোমাদের গৃহে রয়েছে তা স্মরণ (হৃদয়ঙ্গম) করবে (এবং এটাও মনে রাখবে যে,) নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ পাক অত্যন্ত সূক্ষ্মদর্শী ও গোপন তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারী (সুতরাং অন্তরের গোপন কার্যক্রম সম্পর্কেও পুরোপুরি অবহিত এবং) সম্পূর্ণ জ্ঞাত (সুতরাং বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ প্রকাশ্য ও গোপন যাবতীয় আদেশসমূহ পালন ও নিষেধাবলীর প্রতি যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করা ওয়াজিব)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এই সূরার উদ্দেশ্যাবলীর মধ্যে অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য সেসব বস্তু ও কার্যাবলী পরিহার করার প্রতি তাকীদ প্রদান, যেগুলো রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কষ্ট ও মর্মবেদনার কারণ হতে পারে। এতদ্ভিন্ন তাঁর (সা) আনুগত্য ও সন্তুষ্টি বিধান সম্পর্কিত নির্দেশাবলীও রয়েছে। উপরে বর্ণিত পরিখার যুদ্ধের বিস্তারিত ঘটনার মধ্যে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র প্রতি কাফির ও মুনাফিকদের অসহনীয় দুঃখ-কষ্ট প্রদান পরিণামে নির্যাতনকারী কাফির ও মুনাফিকদের চরম লাঞ্ছনা ও অবমাননা এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রে মুসলমানদের অতুলনীয় বিজয় ও সাফল্যের বিবরণ ছিল। সংগে সংগে সেসব নিষ্ঠাবান মু'মিনগণের প্রশংসা এবং পরকালে তাঁদের উচ্চ মর্যাদারও বর্ণনা ছিল, যারা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র আদেশ-ইঙ্গিতে নিজেদের সর্বস্ব---কোরবান করে দিয়েছিলেন।

উপরোল্লিখিত আয়াতসমূহে নবীজী (সা)-র পুণ্যবতী স্ত্রীগণের প্রতি বিশেষ নির্দেশ রয়েছে যেন তাঁদের কোন কথা ও কাজের দ্বারা হুযূরে পাকের (সা) প্রতি কোন দুঃখ-যন্ত্রণা না পৌঁছে ; সেদিকে যেন তাঁরা যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করেন। আর তা তখনই হতে পারে, যখন তাঁরা আল্লাহ্ পাক ও তাঁর রসূল (সা)-এর প্রতি পূর্ণভাবে অনুগত থাকবেন। এ প্রসঙ্গে পুণ্যবতী পত্নীগণকে (রা) সম্বোধন করে কয়েকটি নির্দেশ রয়েছে।

শুরুর আয়াতসমূহে তাঁদেরকে যে তালাক গ্রহণের অধিকার প্রদানের কথা বর্ণনা করা হয়েছে, এ সম্পর্কিত পুণ্যবতী স্ত্রীগণ (রা) কর্তৃক সংঘটিত এক বা একাধিক এমন ঘটনা রয়েছে, যা নবীজীর মর্জির পরিপন্থী ছিল, যদ্দ্বারা রসূলুল্লাহ্ (সা) অনিচ্ছাকৃতভাবেই দুঃখ পান।

এসব ঘটনার মধ্যে একটি ঘটনা যা সহীহ্ মুসলিম প্রভৃতি হাদীসগ্রন্থে হযরত জাবের (রা)-এর রেওয়ায়েতে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে, বলা হয়েছে, একদা পুণ্যবতী স্ত্রীগণ (রা) সমবেতভাবে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র খিদমতে তাঁদের জীবিকা ও অন্যান্য খরচাদির পরিমাণ বৃদ্ধির দাবি পেশ করেন। বিশিষ্ট মুফাস্সির আবূ হাইয়ান এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা তফসীরে বাহরে-মুহীতে এরূপভাবে প্রদান করেন যে, আহযাব যুদ্ধের পর বনূ নযীর ও বনূ কোরায়যার বিজয় এবং গনীমতের মাল বণ্টনের ফলে সাধারণ মুসলমানগণের মধ্যে খানিকটা স্বাচ্ছন্দ্য ফিরে আসে। এ পরিপ্রেক্ষিতে পুণ্যবতী স্ত্রীগণ (রা) ভাবলেন যে, আঁ হযরত (সা)-ও হয়ত এসব গনীমতের মাল থেকে নিজস্ব অংশ রেখে দিয়েছেন। তাই তাঁরা সমবেতভাবে আরয করলেন----ইয়া রসূলাল্লাহ্ (সা)! পারস্য ও রোমের সাম্রাজ্ঞীগণ নানাবিধ গহনাপত্র ও বহু মূল্যবান পোশাক পরিচ্ছদ ব্যবহার করে থাকে ; এবং তাদের সেবা-যত্নের জন্য অগণিত দাস-দাসী রয়েছে। আমাদের দারিদ্র্য পীড়িত জীর্ণ-শীর্ণ করুণ অবস্থা তো আপনি স্বয়ংই দেখতে পাচ্ছেন। তাই মেহেরবানী পূর্বক আমাদের জীবিকা ও অন্যান্য খরচাদির পরিমাণ খানিকটা বৃদ্ধির কথা বিবেচনা করুন।

রসূলুল্লাহ্ (সা) পুণ্যবতী স্ত্রীগণের (রা) পক্ষ থেকে দুনিয়াদার ভোগ বিলাসী রাজ-রাজড়াদের পরিবেশে বিদ্যমান জৌলুস ও সুযোগ-সুবিধা প্রদানের দাবিতে উপস্থাপিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এ কারণে বিশেষভাবে মর্মাহত হন যে, তাঁরা নবীগৃহের প্রকৃত মর্যাদা অনুধাবন করতে সক্ষম হন নি। এর ফলে নবীজী (সা) যে দুঃখিত হবেন তা তাঁরা ধারণা করতে পারেন নি। সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে প্রাচুর্য ও সম্পদ বৃদ্ধি দেখে তাঁদের মাঝে খানিকটা প্রাচুর্যের অভিলাষের উদ্রেক করেছিল। ভাষ্যকার আবূ হাইয়ান বলেন যে, আহযাবের যুদ্ধের পর এ ঘটনা বর্ণনা করার দ্বারা একথাই সমর্থিত হয় যে, নবী-পত্নীগণের (রা) এ দাবীই ছিল তাঁদেরকে তালাক গ্রহণের অধিকার প্রদানের কারণ।

কোন কোন রেওয়ায়েত অনুসারে পরবর্তী সূরায়ে তাহ্রীমে সবিস্তার বর্ণিত হযরত যয়নব (রা)-এর গৃহে মধু পানের কারণে স্ত্রীগণের (রা) পারস্পরিক আত্মমর্যাদা-বোধের পরিপ্রেক্ষিতে উদ্ভূত পরিস্থিতিই তালাকের অধিকার প্রদানের কারণ। এক্ষণে যদি উভয় ঘটনা কাছাকাছি সময়েই সংঘটিত হয়ে থাকে, তবে উভয়ই কারণরূপে বিবেচিত হতে পারে। কিন্তু অধিকার প্রদান সংশ্লিষ্ট আয়াতে ব্যবহৃত শব্দাবলী দ্বারা একথারই সমর্থন অধিক মিলে যে, পুণ্যবতী স্ত্রীগণের পক্ষ থেকে কোন প্রকারের আর্থিক দাবিই এর কারণ ছিল। কেননা আয়াতে ইরশাদ হয়েছে যেঃ اِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا الاية অর্থাৎ যদি তোমরা পার্থিব জীবনের জৌলুস ও চাকচিক্য কামনা কর ...।

এ আয়াতে সকল পুণ্যবতী স্ত্রীগণকে (রা) অধিকার প্রদান করা হয়েছে যে, তাঁরা নবীজী (সা)-র বর্তমান দারিদ্র্য পীড়িত চরম আর্থিক সঙ্কটপূর্ণ অবস্থা বরণ করে হয় তাঁর (সা) সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রেখে জীবন যাপন করবেন অথবা তালাকের মাধ্যমে তাঁর থেকে মুক্ত হয়ে যাবেন। প্রথমাবস্থায় অন্যান্য স্ত্রীলোকের তুলনায় পুরস্কার এবং পরকালে স্বতন্ত্র ও সুউচ্চ মর্যাদাসমূহের অধিকারী হবেন! আর দ্বিতীয় অবস্থায়, অর্থাৎ---তালাক গ্রহণের পরিপ্রেক্ষিতেও তাঁদেরকে দুনিয়ার অপরাপর লোকের ন্যায় বিশেষ জটিলতা ও অপ্রীতিকর অবস্থার সম্মুখীন হতে হবে না; বরং সুন্নত মুতাবিক যুগল বস্ত্র প্রভৃতি প্রদান করে সসম্মানে বিদায় দেওয়া হবে।

তিরমিযী শরীফে উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, যখন অধিকার প্রদানের এ আয়াত নাযিল হয় তখন রসূলুল্লাহ্ (সা) আমার থেকে ইহা প্রকাশ ও প্রচারের সূচনা করেন। আর আয়াত শুনানোর পূর্বে বলেন যে, আমি তোমাকে একটি কথা বলব---উত্তরটা কিন্তু তাড়াহুড়া করে দেবে না। বরং তোমার পিতামাতার সাথে পরামর্শের পর উত্তর দেবে। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) বলেন, আমাকে আমার পিতামাতার সাথে পরামর্শ না করে মতামত প্রকাশ করা থেকে যে

বারণ করেছিলেন, তা ছিল আমার প্রতি তাঁর (সা) এক অপার অনুগ্রহ। কেননা তাঁর অটুট বিশ্বাস ছিল যে, আমার পিতামাতা কখখনো আমাকে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র থেকে বিচ্ছেদ অবলম্বনের জন্য পরামর্শ প্রদান করবেন না। এ আয়াত শুনার সংগে সংগেই আমি আরয করলাম যে, এ ব্যাপারে আমার পিতামাতার পরামর্শ গ্রহণের জন্য আমি যেতে পারি কি? আমি তো আল্লাহ্ পাক, তাঁর রসূল ও পরকালকে বরণ করে নিচ্ছি। আমার পরে অন্যান্য সকল পুণ্যবতী পত্নীগণকে (রা) কোরআনে পাকের এ নির্দেশ শোনানো হলো। আমার ন্যায় সবাই একই মত ব্যক্ত করলেন। রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সাথে দাম্পত্য সম্পর্কের মুকাবিলায় ইহলৌকিক প্রাচুর্য ও স্বাচ্ছন্দ্যকে কেউ গ্রহণ করলেন না (তিরমিযী শরীফে এ হাদীস সহীহ্ ও হাসান বলে মন্তব্য করা হয়েছে)।

ফায়দা ঃ তালাক গ্রহণের দু'টো পদ্ধতি রয়েছে---প্রথমটি এই যে, তালাকের অধিকার স্ত্রীর হাতে ন্যস্ত করা, অর্থাৎ সে যদি চায় তালাকের মাধ্যমে নিজেকে মুক্ত করে নিতে পারে। দ্বিতীয়টি এই যে, তালাকের অধিকার স্বামীর নিকটেই থাকবে। অবশ্য যদি স্ত্রী চায় তখন সে তালাক দেবে।

উল্লিখিত আয়াতে কোন কোন মুফাস্সির প্রথমটি এবং কোন কোন মুফাস্সির দ্বিতীয়টি গ্রহণ করেছেন। হাকীমুল উম্মাত হযরত থানভী (র) বয়ানুল কোরআনে ফরমান যে, উল্লিখিত আয়াতে ব্যবহৃত শব্দসমূহ অনুযায়ী প্রকৃত প্রস্তাবে উভয়টারই সম্ভাবনা রয়েছে। সুস্পষ্ট আয়াত বা হাদীস দ্বারা কোন একটা নির্দিষ্ট না হওয়া পর্যন্ত নিজের পক্ষ থেকে কোনটা নির্দিষ্ট করার প্রয়োজন নেই।

মাস'আলা ঃ এ আয়াত থেকে জানা গেল যে, যদি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মিলমিশ স্থাপন সম্ভবপর না হয়, তবে স্ত্রীকে এ অধিকার প্রদান করা মুস্তাহাব যে, চাই সে স্বামীর বর্তমান অবস্থার উপর তুষ্ট থেকে তার সাথে যথারীতি বসবাস করুক, অন্যথায় সুন্নাত মুতাবিক তালাক দিয়ে যুগল বস্ত্রদ্বয় প্রদান করে তাকে সসম্মানে বিদায় দেওয়া হোক।

উল্লিখিত আয়াত দ্বারা এ ব্যাপারটি কেবল মুস্তাহাব বলেই প্রমাণ করা যায়---ইহা ওয়াজিব হওয়ার কোন দলীল নেই। কোন কোন ফিকাহ্ শাস্ত্রবিদ্ এ আয়াত থেকেই ইহা ওয়াজিব হওয়ার প্রমাণ বের করেছেন। এ কারণেই কোন দরিদ্র ব্যক্তি যদি স্ত্রীর যাবতীয় ব্যয়ভার নির্বাহ করতে সক্ষম না হয় সেক্ষেত্রে আদালত তালাক দেওয়ার অধিকার স্ত্রীকেই প্রদান করে। এ মাস'আলার বিস্তারিত বিবরণ আরবী ভাষায় লিখিত আহ্কামুল কোরআনের পঞ্চম পরিচ্ছেদে এ আয়াতেরই প্রসংগক্রমে বর্ণনা করা হয়েছে।

পুণ্যবতী স্ত্রীগণের (রা) একটি বৈশিষ্ট্য ঃ يٰنِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَّاْتِ مِنْكُنَّ

بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُّضٰعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ

يَسِيْرًا ۝ وَمَنْ يَّقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتَعْمَلْ صَالِحًا

نُّؤْتِهَا اَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ الاية এ দু' আয়াতে পুণ্যবতী স্ত্রীগণের (রা) এ বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে যে, তাঁরা যদি ঘটনাক্রমে কোন পাপ কাজ করেন, তবে তাঁদেরকে অন্যান্য মহিলাগণের তুলনায় দ্বিগুণ শাস্তি প্রদান করা হবে। অর্থাৎ, তাঁদের এক পাপ দু'টোর স্থলাভিষিক্ত বলে গণ্য করা হবে। অনুরূপভাবে তাঁদের দ্বারা কোন নেক কাজ সংঘটিত হলেও অন্যান্য স্ত্রীলোকের তুলনায় দ্বিগুণ সওয়াব লাভ করবেন, আর তাঁদের একটি নেক কাজ দু'টোর স্থলাভিষিক্ত হবে।

একদিক দিয়ে আয়াত পুণ্যবতী স্ত্রীগণের (ازواج مطهرات) ঐ আমলের প্রতিদান যা তারা অধিকার প্রদানের আয়াত (ايات تخيير) নাযিল হওয়ার পর পার্থিব ভোগ-বিলাস ও প্রাচুর্যের উপর নবীজী (সা)-র সাথে দাম্পত্য সম্পর্ককে অগ্রাধিকার প্রদানের মাধ্যমে সম্পন্ন করেছেন। যার বিনিময়ে আল্লাহ্ পাক তাঁদের একটি আমলকে দু'য়ের মানে উন্নত করেছেন। আর গুনাহ্র বেলায় দ্বিগুণ শাস্তি লাভও তাঁদের স্বতন্ত্র মর্যাদার পরিপ্রেক্ষিতেই হয়েছে। কেননা একথা সম্পূর্ণ যুক্তিসংগত ও বাস্তব ভিত্তিক যে, যাদের মান মর্যাদা যত উন্নত সে অনুপাতে তাদের নির্লিপ্ততা ও অবাধ্যতার শাস্তিও বৃদ্ধি পায়।

পুণ্যবতী স্ত্রীগণের (ازواج مطهرات) উপর আল্লাহ্ পাকের অনুগ্রহরাজি ছিল অতি মহান। কেননা আল্লাহ্ পাক তাঁদেরকে নবীজী (সা)-র পত্নীরূপে মনোনীত করেছেন---তাঁদের গৃহে ওহী নাযিল করেছেন। সুতরাং তাঁদের নগণ্য ত্রুটি-বিচ্যুতি আর দুর্বলতাও বড় বলে বিবেচিত হবে। যদি এঁদের দ্বারা কোন বেদনাদায়ক কথা বা আচরণ সংঘটিত হয়, তবে তা অন্যদের অনুরূপ আচরণের তুলনায় নবীজীর পক্ষে অধিকতর কঠিন ও মনোকষ্টের কারণ হবে। কোরআনে করীমের এসব শব্দ-সমূহে এর কারণের প্রতি ইঙ্গিত হয়েছেঃ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلٰى فِىْ بُيُوْتِكُنَّ-

ফায়েদা ঃ সাধারণ উম্মতের তুলনায় পুণ্যবতী স্ত্রীগণ (ازواج مطهرات) তাঁদের কৃতকর্মের দ্বিগুণ ফল লাভ করবেন---এ বৈশিষ্ট্যের পরিপ্রেক্ষিতে একথা বোঝায় না যে, উম্মতের কোন ব্যক্তি বা দল বিশেষ কোন বৈশিষ্ট্যের পরিপ্রেক্ষিতে দ্বিগুণ পুরস্কার ও প্রতিদান লাভের অধিকারী হতে পারবে না। বস্তুত আহ্লে

কিতাবের মধ্যে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছেন তাঁদের সম্পর্কে কোরআনে পাকে ইরশাদ হয়েছে أُولَٰئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ তাদেরকে দু'বার প্রতিদান প্রদান করা হবে)।

রসূলুল্লাহ (সা) রোম সম্রাটের নামে যে চিঠি প্রেরণ করেন কোরআনের এই ইরশাদানুসারে তিনি (সা) তাতে রোমান সম্রাটকে লিখেন যেঃ يؤتك الله أجرك مرتين (আল্লাহ্ পাক আপনার প্রতিফল দু'বার প্রদান করবেন)। যেসব আহ্লে কিতাব (কোরআন ব্যতীত অন্য কোন ঐশী গ্রন্থে বিশ্বাসী) ইসলাম গ্রহণ করবে তাদের দু'বার প্রতিফল লাভের কথা তো কোরআনে পাকে স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে। অপর এক হাদীসেও তিন ব্যক্তি সম্পর্কে দ্বিগুণ প্রতিফল লাভের কথা বর্ণিত আছে, যা বিস্তারিতভাবে সূরা কাসাসে (سورة قصص) يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ আয়াত প্রসঙ্গে বর্ণনা করা হয়েছে।

আলিমের সৎকাজের প্রতিফল এবং পাপের শাস্তিও অন্যদের চাইতে অধিক ঃ ইমাম আবূ বকর জাস্সাস আহ্কামুল কোরআনে উল্লেখ করেছেন যে, আল্লাহ্ পাক যে কারণে পুণ্যবতী স্ত্রীগণের (أزواج مطهرات) নেক কাজের সওয়াব ও পাপের শাস্তি দ্বিগুণ হবে বলে ঘোষণা করেছেন---তা হলো যে, তারা উলুমে নবুয়ত ও ওহীয়ে ইলাহীর বিশেষ অবতরণ স্থল। সুতরাং যে সব আলিম নিজ ইলম অনুযায়ী আমল করবেন, তাঁরাও তাঁদের আমলের সওয়াব অন্যদের চাইতে অধিক লাভ করবেন। পক্ষান্তরে যদি তাঁরা কোন পাপ কাজে লিপ্ত হন, তবে শাস্তিও হবে অন্যদের চাইতে বেশি।

فَاحِشَةٍ---بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ আরবী ভাষায় অশ্লীলতা, ব্যভিচার প্রভৃতি অর্থে ব্যবহৃত হয়। এ শব্দটি সাধারণ পাপ-পঙ্কিলতা অর্থেও কোরআনে পাকে বহু জায়গায় ব্যবহৃত হয়েছে। এ আয়াতে فَاحِشَةٍ শব্দ যিনা বা ব্যভিচার অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে না। কেননা আল্লাহ পাক সমস্ত নবীর স্ত্রীকুলকে এই জঘন্য ত্রুটি থেকে মুক্ত রেখেছেন। সমস্ত আম্বিয়া (আ)-র স্ত্রীগণের মধ্যে কারো দ্বারা এরূপ অপকর্ম সংঘটিত হয়নি। হযরত লূত ও নূহ (আ)-এর স্ত্রীগণ তাঁদের ধর্ম থেকে পরাঙ্মুখ ছিল ---অবাধ্যতা ও ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করেছিল---যার শাস্তিও তারা লাভ করেছিল। কিন্তু তাদের কারো উপরই ব্যভিচারের অপবাদ ছিল না। আযওয়াজে মুতাহ্হারাতের থেকে কোন প্রকারের অশালীনতা ও অশ্লীলতার বহিপ্রকাশ তো সম্ভবই ছিল না। সুতরাং এ আয়াতে فَاحِشَةٍ অর্থ সাধারণ গুনাহ্ বা রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দুঃখ-কষ্ট

দেওয়া। এ জায়গায় فَاحِشَة শব্দের সাথে ব্যবহৃত مُبَيِّنَة শব্দের দ্বারা এ কথাই প্রমাণিত হয়। কেননা যিনা বা ব্যভিচার কখনো প্রকাশ্যভাবে সংঘটিত হয় না। বরং তা পর্দার আড়ালে গোপনে সংঘটিত হয়ে থাকে। সুতরাং فاحشة مبينة এর অর্থ সাধারণ পাপ বা রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দুঃখ-যন্ত্রণা দেয়া। বিশিষ্ট মুফাস্‌সিরগণের মধ্যে মোকাতেল বিন সোলায়মান এ আয়াতে ফাহেশার (فاحشة) অর্থ রসূলুল্লাহ্ (সা)-র নাফরমানী বা তাঁর নিকট এমন দাবি পেশ করা, যা তাঁর (সা) পক্ষে পূরণ করা কঠিন বলে ব্যক্ত করেছেন।---(বায়হাকী)

কোরআনে করীমে শাস্তি লাভ কেবল (فاحشة مبينة) ---ফাহেশায়ে মোবাইয়েনার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য বলে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু দ্বিগুণ সওয়াব ও প্রতিফল লাভের জন্য কয়েকটি শর্ত আরোপ করা হয়েছে ; وَمَنْ يَّقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتَعْمَلْ صَالِحًا এখানে قنوت অর্থাৎ---আল্লাহ্ পাক ও তাঁর রসূল (সা)-এর অনুসরণ ও আনুগত্য শর্ত এবং সৎকাজও শর্ত। কেননা প্রতিফল ও সওয়াব তো কেবল তখনই লাভ করা যায়, যখন পরিপূর্ণ আনুগত্য ও অনুকরণ পাওয়া যায়। কিন্তু শাস্তির জন্য কেবল একটি পাপই যথেষ্ট।

পুণ্যবতী স্ত্রীগণের প্রতি বিশেষ হিদায়ত ঃ يٰنِسَآءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَاَحَدٍ مِّنَ النِّسَآءِ اِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ --পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে পুণ্যবতী স্ত্রীগণকে (রা) রসূলুল্লাহ্ (সা) সমীপে এমন সব দাবি পেশ করতে বারণ করা হয়েছে, তাঁর পক্ষে যা পূরণ করা কঠিন বা যা তাঁর মহান মর্যাদার পক্ষে অশোভনীয়। যখন তাঁরা তা মেনে নিয়েছেন, তখন সাধারণ নারীদের থেকে তাঁদের মর্যাদা বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এবং তাঁদের এক আমলকে দু'য়ের সমতুল্য করে দেওয়া হয়েছে। পরবর্তী পর্যায়ে তাঁদের কর্মের পরিশুদ্ধি এবং রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সান্নিধ্য ও দাম্পত্য সম্পর্কের যোগ্য করে গড়ে তোলার জন্য কয়েকটি হিদায়ত প্রদান করা হয়েছে। এসব হিদায়ত যদিও পুণ্যবতী স্ত্রীগণের (ازواج مطهرات) জন্য নির্দিষ্ট নয়; বরং সমগ্র মুসলিম নারীকুলের প্রতিই তা নির্দেশিত। কিন্তু এখানে তাঁদেরকে (সা) বিশেষভাবে সম্বোধন করে তাঁদের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট করা হয়েছে যে, এসব আমল ও আহ্‌কাম তো সমস্ত মুসলিম

রমণীকুলের প্রতি ওয়াজিব ও অবশ্য পালনীয়। তাই এগুলোর প্রতি তাঁদের বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা উচিত। আর لَسْتُنَّ كَاَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ দ্বারা এ বিশেষত্বই বোঝানো হয়েছে।

নবীজী (সা)-র পুণ্যবতী স্ত্রীগণ বিশ্বের সমস্ত নারীকুলের চাইতে শ্রেষ্ঠ কি? আয়াতের শব্দাবলী দ্বারা বাহ্যিকভাবে বোঝা যায় রসূলুল্লাহ্ (সা)-র পুণ্যবতী স্ত্রীগণ বিশ্বের সমস্ত নারীকুলের চাইতে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু হযরত মরিয়ম (আ) সম্পর্কে কোরআনের বাণী এই إِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفٰكِ عَلٰى نِسَاءِ الْعٰلَمِيْنَ (অর্থাৎ নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পাক আপনাকে মনোনীত করেছেন, পবিত্র ও কালিমামুক্ত করেছেন এবং বিশ্বের সমস্ত নারীকুলের উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছেন।) এ দ্বারা হযরত মরিয়ম (আ) সমস্ত নারীজাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে প্রমাণিত হন। তিরমিযী শরীফে হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেছেন---সমগ্র রমণীকুলের মধ্যে হযরত মরিয়ম, উম্মুল মু'মিনীন হযরত খাদীজাতুল কোবরা, হযরত ফাতেমা এবং ফিরাউন-পত্নী হযরত আসিয়া (আ)-ই তোমাদের জন্য যথেষ্ট। এ হাদীসে হযরত মরিয়মের সাথে আরো তিনজনকে নারী জাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

এ আয়াতে আযওয়াজে মুতাহ্হারাতের যে শ্রেষ্ঠত্ব ও উচ্চ মর্যাদার কথা বলা হয়েছে তা এক বিশেষ দিক বিবেচনায়---নবী-পত্নী হিসাবে। এদিক দিয়ে তাঁরা নিঃসন্দেহে সমস্ত রমণীকুলের চাইতে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু এ দ্বারা সকল দিক দিয়ে তাঁদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয় না---যা অন্যান্য কোরআনের আয়াত ও হাদীসের পরিপন্থী। ---(মাযহারী)

لَسْتُنَّ كَاَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ এর পর إِنِ اتَّقَيْتُنَّ আল্লাহ্ পাক তাঁদের নবী-পত্নী হিসাবে যে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছেন, তারই ভিত্তিতে এ শর্ত, এর উদ্দেশ্য এ বিষয়ে সতর্ক করে দেওয়া যেন তাঁরা নবীজী (সা)-র পত্নী হওয়ার সম্পর্কের উপর ভরসা করে বসে না থাকেন। বস্তুত তাঁদের শ্রেষ্ঠত্বের শর্ত হলো তাক্ওয়া এবং আহকামে ইলাহিয়ার অনুসরণ ও অনুকরণ।----(কুরতুবী ও মাযহারী)

এর পর আযওয়াজে মুতাহহারাতের উদ্দেশ্যে কয়েকটি হিদায়ত রয়েছে।

প্রথম হিদায়ত ঃ নারীদের পর্দা সম্পর্কিত তাঁদের কণ্ঠ ও বাক্যালাপ নিয়ন্ত্রণ সংশ্লিষ্ট ঃ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ অর্থাৎ যদি পরপুরুষের সাথে পর্দার অন্তরাল থেকে কথা বলার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় তবে বাক্যালাপের সময় কৃত্রিমভাবে নারী

কণ্ঠের স্বভাবসুলভ কোমলতা ও নাজুকতা পরিহার করবে। অর্থাৎ এমন কোমলতা যা শ্রোতার মনে অবাঞ্ছিত কামনা সঞ্চার করে। যেমন এর পরে বিবৃত হয়েছে فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ অর্থাৎ---এরূপ কোমল কণ্ঠে বাক্যালাপ করো না যাতে ব্যাধিগ্রস্ত অন্তর বিশিষ্ট লোকের মনে কুলালসা ও আকর্ষণের উদ্রেক করে। ব্যাধি অর্থ নিফাক (কপটতা) বা এর শাখা বিশেষ। প্রকৃত মুনাফিকদের মনে এমন লালসার সঞ্চার হওয়া তো স্বাভাবিক। কিন্তু কোন লোক খাঁটি মু'মিন হওয়া সত্ত্বেও যদি কোন হারামের প্রতি আকৃষ্ট হয় তবে সে মুনাফিক নয় সত্য কিন্তু অবশ্যই দুর্বল ঈমান বিশিষ্ট। এরূপ দুর্বল ঈমান যা হারামের দিকে আকৃষ্ট করে প্রকৃত প্রস্তাবে তা কপটতারই (নিফাকের) শাখা বিশেষ। কপটতার লেশ বিমুক্ত খাঁটি ঈমান বিশিষ্ট লোক কোন হারামের প্রতি আকৃষ্ট হতে পারে না।---(মাযহারী)

প্রথম হিদায়তের সারমর্ম এই যে, নারীদেরকে পরপুরুষ থেকে নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করে পর্দার এমন উন্নত স্তর অর্জন করা উচিত, যাতে কোন অপরিচিত দুর্বল ঈমান বিশিষ্ট লোকের অন্তরে কোন কামনা ও লালসার উদ্রেক তো করবেই না বরং তার নিকটেও যেন ঘেঁষতে না পারে। নারীদের পর্দার বিস্তারিত বিবরণ এই সূরারই পরবর্তী আয়াতসমূহের আলোচনা প্রসঙ্গে আলোচিত হবে। এখানে নবীজীর সহ-ধর্মিণীগণের বিশেষ হিদায়তসমূহের সহিত প্রাসংগিকভাবে যা এসেছে শুধু তারই ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে। আয়াতে বর্ণিত বাক্যালাপ-সংশ্লিষ্ট হিদায়তসমূহ শ্রবণ করার পর উম্মাহাতুল মু'মিনীনগণের কেহ যদি পরপুরুষের সাথে কথা-বার্তা বলতেন, তবে মুখে হাত রেখে বলতেন---যাতে কণ্ঠস্বর পরিবর্তিত হয়ে যায়। এজন্যই হযরত আমর ইবনুল আস (রা) কর্তৃক বর্ণিত এক হাদীসে রয়েছে ঃ ان النبى صلعم نهى ان تكلم النساء الا باذن ازواجهن — অর্থাৎ নবী করীম (সা) নারী-দেরকে নিজ নিজ স্বামীর অনুমতি ব্যতীত বাক্যালাপ করতে বিশেষভাবে বারণ করেছেন। ---(তাবারানী-মাযহারী)

মাস'আলা ঃ এ আয়াত ও উল্লিখিত হাদীস থেকে এতটুকু প্রমাণিত হয়েছে যে, নারীদের কণ্ঠস্বর সতরের অন্তর্ভুক্ত নয়। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও সতর্কতামূলক নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়েছে, যা যাবতীয় ইবাদত ও আহকামে অনুসৃত হয়েছে। পরপুরুষ শুনতে পায়---নারীদেরকে এমন উচ্চস্বরে কথা-বার্তা বলতে বারণ করা হয়েছে। নামাযের সময় ইমাম কোন ভুল করলে মুক্তাদিদের মৌখিকভাবে লুকমা দেওয়ার হুকুম রয়েছে। কিন্তু মেয়েদেরকে মৌখিক লুকমা দেওয়ার পরিবর্তে এ শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, নিজের এক হাতের পিঠের উপর অপর হাত মেরে তালি বাজিয়ে ইমামকে অবহিত করবে----মুখে কিছু বলবে না।

দ্বিতীয় হিদায়ত---পূর্ণ পর্দা করা সম্পর্কিত। وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ

وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ – অর্থাৎ তোমরা তোমাদের গৃহে অবস্থান কর এবং জাহিলিয়াত যুগের নারীদের ন্যায় দেহ সৌষ্ঠব ও সৌন্দর্য প্রদর্শন করে ঘোরাফেরা করো না। এখানে পূর্ববর্তী অন্ধযুগ বলে ইসলাম-পূর্ব অন্ধ যুগকে বোঝানো হয়েছে---যা বিশ্বের সর্বত্র বিস্তৃত ছিল। এ শব্দে এ ইঙ্গিত রয়েছে যে, এরপর আবার অপর কোন অজ্ঞতার প্রাদুর্ভাবও ঘটতে পারে, যে সময় এই প্রকার নির্লজ্জতা ও পর্দাহীনতাই বিস্তার লাভ করবে। সেটা সম্ভবত এ যুগের অজ্ঞতাই যা অধুনা বিশ্বের সর্বত্র পরিদৃষ্ট হচ্ছে। এ আয়াতে পর্দা সম্পর্কিত আসল হুকুম এই যে, নারীগণ গৃহেই অবস্থান করবে (অর্থাৎ শরয়ী প্রয়োজন ব্যতীত যেন বাইরে বের না হয়)। সাথে সাথে এ কথাও বলা হয়েছে যে, যেভাবে ইসলামপূর্ব অজ্ঞ যুগের নারীরা প্রকাশ্যভাবে বেপর্দা চলাফেরা করত---তোমরা সেরকম চলাফেরা করো না। تبرج শব্দের মূল অর্থ---প্রকাশ ও প্রদর্শন করা। এখানে এর অর্থ পরপুরুষ সমীপে স্বীয় সৌন্দর্য প্রদর্শন করা। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ (অর্থাৎ সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে)। নারীদের পর্দা সম্পর্কিত পূর্ণ আলোচনা ও বিস্তারিত আহকাম এ সূরারই পরবর্তী অধ্যায়ে বর্ণিত হবে। এখানে কেবল উল্লিখিত আয়াতের ব্যাখ্যা প্রদত্ত হচ্ছে। এ আয়াতে পর্দা সম্পর্কিত দু'টি বিষয় জানা গেছে। প্রথমত---প্রকৃত প্রস্তাবে আল্লাহ্ পাকের নিকট নারীদের বাড়ি থেকে বের না হওয়াই কাম্য---গৃহকর্ম সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যেই তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে ; এতেই তারা পুরোপুরি আত্মনিয়োগ করবে। বস্তুত শরীয়তকাম্য আসল পর্দা হল গৃহের অভ্যন্তরে অনুসৃত পর্দা।

দ্বিতীয়ত, একথা জানা গেছে যে, শরয়ী প্রয়োজনের তাকীদে যদি নারীকে বাড়ি থেকে বের হতে হয়, তবে যেন সৌন্দর্য ও দেহ সৌষ্ঠব প্রদর্শন না করে বের হয় ; বরং বোরকা বা গোটা শরীর আবৃত করে ফেলে---এমন চাদর ব্যবহার করে বের হবে। যেমন সামনে সূরা আহযাবেরই وَيُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ – আয়াতে ইনশাআল্লাহ্ বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

গৃহে অবস্থান প্রয়োজন সম্পর্কিত হুকুমের অন্তর্গত নয় ঃ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ দ্বারা নারীদের ঘরে অবস্থান ওয়াজিব করে দেওয়া হয়েছে। এর মর্ম এই যে, নারীর পক্ষে ঘর থেকে বের হওয়া সাধারণভাবে তো নিষিদ্ধ ও হারাম। কিন্তু প্রথমত এ আয়াতেই وَلَا تَبَرَّجْنَ দ্বারা এদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে বের হওয়া নিষিদ্ধ নয়। বরং সৌন্দর্য প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে বের হওয়া নিষিদ্ধ।

দ্বিতীয়ত, এই সূরায়ে আহযাবেরই পরবর্তীতে উল্লিখিত يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ আয়াতে এ হুকুমই রয়েছে যে, বিশেষ প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে মেয়েদের বোরকা বা অন্য কোন প্রকারে পর্দা করে ঘর হতে বের হওয়ার অনুমতি আছে।

এতদ্ভিন্ন রসূলুল্লাহ্ (সা) এক হাদীস দ্বারাও প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রসমূহ যে এ হুকুমের অন্তর্গত নয়, তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন। যেখানে পূণ্যবতী সহধর্মিণীগণকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে ঃ قد اذن لكن ان تخرجن لحاجتكن (رواه مسلم) অর্থাৎ "প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে তোমাদেরকে বাড়ি থেকে বের হওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।" এতদ্ভিন্ন পর্দার আয়াত নাযিল হওয়ার পরও রসূলুল্লাহ্ (সা)-র আমল এ সাক্ষ্য প্রদান করে যে, প্রয়োজনীয় স্থলে মেয়েদের ঘর থেকে বের হওয়ার অনুমতি রয়েছে। যেমন হজ্জ ও ওমরার সময় হুযূর (সা)-এর সাথে তাঁর সহধর্মিণীগণের গমনের কথা বহু বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। অনুরূপভাবে তাঁর সাথে তাঁদের বিভিন্ন যুদ্ধে গমন করাও প্রমাণিত রয়েছে। আবার অনেক রেওয়ায়েতে এ প্রমাণও পাওয়া যায় যে, নবীজীর পূণ্যবতী স্ত্রীগণ পিতা-মাতা ও অন্যান্য মুহ্‌রিম আত্মীয়দের সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে নিজেদের বাড়ি থেকে বের হতেন এবং আত্মীয়-স্বজনের রোগ-ব্যাধির তথ্য নিতে যেতেন ও শোকানুষ্ঠান প্রভৃতিতে অংশগ্রহণ করতেন। এছাড়া নবীজী (সা)-র জীবদ্দশায় তাঁদের মসজিদে যাওয়ারও অনুমতি ছিল।

শুধু হুযূর (সা)-এর সাথে ও তাঁর সময়েই এমন ঘটেনি; বরং হুযূরের ইন্তেকালের পরও হযরত সাওদা ও যয়নাব বিনতে জাহ্‌শ (রা) ব্যতীত অন্যান্য সকল পূণ্যবতী স্ত্রীগণের হজ্জ ও ওমরার উদ্দেশ্যে গমন করার প্রমাণ রয়েছে। আর এ সম্পর্কে সাহাবায়ে কিরাম (রা)-ও কোন আপত্তি তোলেন নি। বরং ফারুকে আযম (রা)-এর খিলাফতকালে তিনি স্বয়ং উদ্যোগ নিয়ে তাদেরকে হজ্জে পাঠাবার ব্যবস্থা করেন। হযরত উসমান গনী (রা)-ও আবদুর রহমান বিন আওফ (রা)-কে তাঁদের ব্যবস্থাপনা ও তত্ত্বাবধানের জন্য প্রেরণ করেন। হুযূর (সা)-এর ইন্তেকালের পর উম্মুল মু'মিনীন হযরত সাওদা ও হযরত যয়নাব বিনতে জাহ্‌শের হজ্জ ও ওমরায় না যাওয়া এ আয়াতের পরিপ্রেক্ষিতে ছিল না; বরং অপর এক হাদীসের ভিত্তিতে ছিল। তা এই যে, বিদায় হজ্জে রসূলুল্লাহ্ (সা) নিজের সাথে সহধর্মিণীগণকে হজ্জ সমাপনান্তে ফেরার পথে বলেন هذه ثم لزوم الحصر — এখানে هذه দ্বারা হজ্জের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে এবং حصير — حصر-এর বহুবচন। যার অর্থ---চাটাই। হাদীসের মর্ম এই যে, তোমাদের বের হওয়া কেবল এজন্য হয়েছে। এরপর নিজেদের বাড়ির চাটাই আঁকড়ে ধরবে---সেখান থেকে বের হবে না। হযরত সাওদা (রা) ও যয়নাব (রা) হাদীসের অর্থ এরূপ করেছেন যে, তোমাদের বের হওয়া কেবল বিদায় হজ্জের জন্যই

বৈধ ছিল, এর পরে আর জায়েয নেই। বাকী অন্য সহধর্মিণীগণ, যাঁদের মধ্যে হযরত আয়েশা (রা)-র ন্যায় শ্রেষ্ঠ ফকীহও শামিল ছিলেন, সবাই হাদীসের মর্ম এরূপ বলে মন্তব্য করেছেন যে, তোমাদের এ সফর যেরূপ এক শরয়ী ইবাদত সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে ছিল তোমাদের অনুরূপ উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বের হওয়া জায়েয। অন্যথায় গৃহেই অবস্থান করা অবশ্য কর্তব্য।

সারকথা এই যে, কোরআনে পাকের ইঙ্গিত, নবীজীর আমল ও সাহাবাগণের ইজমা (সর্বসম্মত মত) অনুসারে প্রয়োজন স্থলসমূহ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ আয়াতের মর্মের অন্তর্গত নয়, হজ্জ-ওমরাহও যার অন্তর্ভুক্ত। আর স্বাভাবিক প্রয়োজনাদি, নিজের পিতামাতা, মুহ্‌রিম আত্মীয়দের সহিত সাক্ষাৎ, অসুস্থ থাকা বিধায় এদের সেবা-শুশ্রূষা, অনুরূপভাবে যদি কারো জীবিকা নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় সামান বা অন্য কোন পন্থা না থাকে, তবে চাকুরী ও কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে বের হওয়াও এরই আওতাভুক্ত। প্রয়োজন স্থলসমূহে বের হওয়ার জন্য শর্ত হলো—অঙ্গ সৌষ্ঠব ও সৌন্দর্য প্রদর্শন করে বের না হওয়া ; বরং বোরকা বা বড় চাদর পরে বের হওয়া।

উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা)-র বসরা গমন এবং উষ্ট্র যুদ্ধে (জংগে জামাল) তাঁর ভূমিকা সম্পর্কে রাফেযীদের অসার ও অযৌক্তিক মন্তব্য ঃ

উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা একথা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়েছে যে, কোরআন পাকের ইঙ্গিত, রসূলুল্লাহ্ (সা)-র আমল এবং সাহাবায়ে কিরাম (রা)-এর ইজমা (সর্বসম্মত রায়) দ্বারা প্রমাণিত যে, প্রয়োজনীয় স্থলসমূহ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ—আয়াতের আওতাবহির্ভূত—হজ্জ ও ওমরাহ প্রভৃতি ধর্মীয় প্রয়োজনসমূহ যার অন্তর্ভুক্ত। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা, হযরত উম্মে সালমা এবং সফিয়্যা (রা) হজ্জ উপলক্ষে মক্কায় তশরীফ নেন, তাঁরা সেখানে হযরত উসমান (রা)-এর শাহাদত ও বিদ্রোহ-সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলীর সংবাদ পেয়ে অত্যন্ত মর্মাহত হন এবং মুসলমানদের পারস্পরিক অনৈক্যের ফলে মুসলিম উম্মতের সংহতি বিনষ্ট হওয়া আর সম্ভাব্য অশান্তি ও উচ্ছৃংখলার আশংকায় বিশেষভাবে উৎকণ্ঠিত ও উদ্বেগাকুল হয়ে পড়েন। এমতাবস্থায় হযরত তালহা, হযরত যুবায়ের, হযরত নোমান বিন বশীর, হযরত কা'ব বিন আযরা এবং আরো কিছুসংখ্যক সাহাবী (রা) মদীনা থেকে পালিয়ে মক্কা পৌঁছেন। কেননা হযরত উসমান (রা)-এর হত্যাকারীগণ এঁদেরকেও হত্যা করার পরিকল্পনা নিয়েছিল। এঁরা বিদ্রোহীদের সাথে শরীক হতে পারেন নি। বরং এ কাজ থেকে তাদেরকে বারণ করছিলেন। হযরত উসমান (রা)-এর হত্যার পর বিদ্রোহীরা এঁদেরকেও হত্যার পরিকল্পনা করে। তাই তাঁরা প্রাণ নিয়ে মক্কা মোয়াজ্জমা এসে পৌঁছেন এবং উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা)-র খিদমতে এসে পরামর্শ চান। হযরত সিদ্দীকা (রা) তাঁদেরকে পরামর্শ দিলেন যে, যে পর্যন্ত বিদ্রোহীরা হযরত আলীকে পরিবেষ্টন

করে থাকবে সে পর্যন্ত যেন তাঁরা মদীনায় ফিরে না যান। আর যেহেতু তিনি তাদের প্রতিকার ও বিচার-বিধান থেকে বিরত থাকছেন ; সুতরাং আপনারা কিছুকাল যেখানে নিজেদেরকে নিরাপদ মনে করেন সেখানে গিয়ে অবস্থান করুন। যে পর্যন্ত আমীরুল মু'মিনীন (রা) পরিস্থিতি আয়ত্তে এনে শৃংখলা বিধানে সক্ষম না হন, সে পর্যন্ত আপনারা বিদ্রোহীদেরকে আমীরুল মু'মিনীনের চতুর্দিক থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার লক্ষ্যে সাধ্যানুসারে চেষ্টা করতে থাকুন, যাতে আমীরুল মু'মিনীন তাদের প্রতিকার ও প্রতিশোধ গ্রহণে সক্ষম হন।

এসব মহাত্মাবৃন্দ এ কথায় রাযী হয়ে বসরা চলে যেতে মনস্থ করেন। কেননা সে সময় তথায় মুসলিম সৈন্যবাহিনী অবস্থান করছিল। এসব মহাত্মাবৃন্দ তথায় যেতে মনস্থির করার পর তাঁরা উম্মুল মু'মিনীন হযরত সিদ্দীকা (রা)-র খিদমতে আরয করলেন যে, যতদিন পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় শৃংখলা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত না হয়, ততদিন পর্যন্ত তিনিও যেন তাঁদের সাথে বসরাতেই অবস্থান করেন।

সে সময়ে হযরত উসমান (রা)-এর হত্যাকারীদের দাপট ও দৌরাত্ম্য এবং তাদের প্রতি আমীরুল মু'মিনীন হযরত আলী (রা)-র শরীয়তী শাস্তি প্রয়োগ অক্ষমতার কথা স্বয়ং নাহজুল-বালাগতের রেওয়ায়েতেও স্পষ্টভাবে বিদ্যমান। উল্লেখযোগ্য যে, নাহজুল-বালাগা শিয়া পণ্ডিতবর্গের নিকট বিশেষ প্রামাণ্য গ্রন্থ বলে সমাদৃত। এই গ্রন্থে রয়েছে যে, হযরত আলী (রা)-কে তাঁর বেশ কিছুসংখ্যক সুহৃদ ও অন্তরঙ্গ বন্ধুবর্গ পর্যন্ত এই মর্মে পরামর্শ দেন যে, যদি আপনি হযরত উসমান (রা)-এর হত্যাকারীদের যথোচিত শাস্তি বিধান করেন তবেই তা বিশেষ কল্যাণ ও সুফল বয়ে আনবে। প্রতিউত্তরে হযরত আমীরুল মু'মিনীন ফরমান যে, ভাই সকল! তোমরা যা বলছ সে সম্পর্কে আমি অজ্ঞ নই। কিন্তু এসব হাঙ্গামা সৃষ্টিকারীদের দ্বারা মদীনা পরিবেষ্টিত থাকা অবস্থায় তা কি করে সম্ভব? তোমাদের ক্রীতদাস ও পার্শ্ববর্তী বেদুঈনরা পর্যন্ত তাদের সাথে রয়েছে। এমতাবস্থায় যদি তাদের শাস্তির নির্দেশ জারী করে দেই তবে তা কার্যকর হবে কিভাবে?

হযরত সিদ্দীকা (রা) একদিকে আমীরুল-মু'মিনীন (রা)-এর অক্ষমতা সম্পর্কে পুরোপুরি ওয়াকিফহাল ছিলেন। অপরদিকে হযরত উসমান (রা)-এর শাহাদতের কারণে মুসলমানগণ যে চরমভাবে মর্মাহত হয়েছেন সে সম্পর্কেও পূর্ণভাবে অবহিত ছিলেন। হযরত উসমান (রা)-এর হত্যাকারীরা আমীরুল-মু'মিনীন (রা)-এর মজলিস-সমূহে সশরীরে শরীক থাকা সত্ত্বেও---তিনি একান্ত অক্ষম ছিলেন বলে তাদের শাস্তি বিধান ও তাদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ বিলম্বিত হচ্ছিল, যারা আমীরুল মু'মিনীন (রা)-এর এই অক্ষমতা সম্পর্কে অবহিত ছিল না, এ ব্যাপারেও তারা তাঁকে অভিযুক্ত করছিল। যাতে এ অভিযোগ-অনুযোগ অন্য কোন অশান্তি ও উচ্ছৃংখলার সূচনা না করে, সেজন্য জনগণকে ধৈর্য ধারণের অনুরোধ করা, আমীরুল-মু'মিনীনের শক্তি সঞ্চার করে রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা সুদৃঢ় করা এবং পারস্পরিক অভিযোগ-অনুযোগ ও ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটিয়ে উম্মতের মাঝে শান্তি ও সংহতি স্থাপনের উদ্দেশ্যে

তিনি (হযরত সিদ্দীকা) বসরা রওয়ানা করেন। এ সময়ে ভাগ্নে হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন যুবায়ের (রা) প্রমুখও তাঁর সাথে ছিলেন। এ সফরের যে উদ্দেশ্য স্বয়ং উম্মুল মু'মিনীন (রা) হযরত কা'কার (রা) নিকট ব্যক্ত করেছেন, তা পরবর্তী পর্যায়ে বর্ণিত হবে। এই চরম অশান্তি ও অরাজকতার সময় মু'মিনদের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা যে কত মহান ও গুরুত্বপূর্ণ দীনি খিদমত ছিল, তা একেবারে সুস্পষ্ট। এতদুদ্দেশ্যে যদি উম্মুল মু'মিনীন (রা)-এর স্বীয় মুহ্‌রিম আত্মীয়-স্বজনের সাথে উটের হাওদায় পূর্ণ পর্দার মধ্যে বসরা গমনকে কেন্দ্র করে "তিনি কোরআনী আহকামের বিরুদ্ধাচরণ করেছেন" বলে শিয়া ও রাফেযী সম্প্রদায় অপপ্রচার করে থাকে, তবে তার কোন যৌক্তিকতা ও সারবত্তা আছে কি?

মুনাফিক ও দুষ্কৃতকারীদের যে অপকীর্তি পরবর্তী পর্যায়ে গৃহযুদ্ধের রূপ পরিগ্রহ করেছিল, সে সম্পর্কে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা)-র কোন ধারণা বা কল্পনাও ছিল না। এ আয়াতের তফসীরের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট। উষ্ট্রযুদ্ধের (জঙ্গে জামাল) সবিস্তার আলোচনার স্থান এটা নয়। নিছক প্রকৃত সত্য উদঘাটনের উদ্দেশ্যে এ প্রসংগে সংক্ষিপ্তভাবে কয়েকটি কথা লিখা হচ্ছে মাত্র।

পারস্পরিক বিভেদ ও দ্বন্দ্ব-কলহের সময় সাধারণত যে সব অবস্থার সৃষ্টি হয় ও যে সব রূপ ধারণ করে, সে সম্পর্কে চক্ষুষ্মান ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ গাফিল ও নির্লিপ্ত থাকতে পারে না। এ ক্ষেত্রেও এরূপ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল যে, সাহাবায়ে কিরাম সমেত হযরত সিদ্দীকা (রা)-র মদীনা হতে বসরা গমনের ঘটনাকে মুনাফিক ও দুষ্কৃতকারীরা আমীরুল-মু'মিনীন হযরত আলী (রা)-র সমীপে বিকৃত করে এভাবে পেশ করে যে, এরা সব আপনার সাথে মুকাবিলা করার জন্য প্রয়োজনীয় সৈন্য সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে বসরা যাচ্ছে। সুতরাং আপনি যদি সত্যি খলীফা হয়ে থাকেন, তবে যাতে এ ফিতনা অগ্রসর হতে না পারে সেজন্য সেখানে গিয়ে অঙ্কুরেই এটা প্রতিহত করা আপনার একান্ত কর্তব্য। হযরত হাসান, হযরত হুসায়ন, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন জাফর, হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রা) প্রমুখ বিশিষ্ট সাহাবী তাঁদের এ মতের বিরুদ্ধাচরণ করে খলীফা (রা)-কে এ পরামর্শ দেন যে, সেখানকার প্রকৃত অবস্থা অনুধাবন না করা পর্যন্ত আপনি তাদের মুকাবিলার জন্য সৈন্য প্রেরণ করবেন না। কিন্তু অপর মত পোষণকারীদের সংখ্যাই ছিল অনেক বেশি। হযরত আলী (রা)-ও এদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে সৈন্যদের সাথে বের হয়ে পড়েন এবং এই অপকৃষ্ট অশান্তি সৃষ্টিকারী বিদ্রোহীরাও তাঁর সাথে রওয়ানা করে।

এঁরা বসরার সন্নিকটে পৌঁছে অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য হযরত উম্মুল মু'মিনীনের খিদমতে হযরত কা'কা (রা)-কে প্রেরণ করেন। তিনি উম্মুল মু'মিনীনের খেদমতে আরয করেন যে, আপনার এখানে আগমনের কারণ কি? প্রত্যুত্তরে হযরত সিদ্দীকা (রা) বলেনঃ اى بنى الاصلاح بين الناس – অর্থাৎ হে প্রিয় বৎস! মানুষের মাঝে শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে এখানে এসেছি। অতঃপর হযরত তালহা ও

হযরত যুবায়ের (রা)-কেও হযরত কা'কা (রা)-র আলোচনা সভায় ডেকে আনা হল। হযরত কা'কা (রা) তাঁদেরকে বললেন যে, আপনারা কি চান। তাঁরা বললেন যে, হযরত উসমানের হত্যাকারীদের প্রতি শরীয়তী শাস্তি প্রয়োগ করা ব্যতীত আমাদের অন্য কোন দাবি বা আকাঙ্ক্ষা নেই। হযরত কা'কা (রা) তাঁদেরকে বোঝাতে চেষ্টা করলেন, যে পর্যন্ত মুসলিম উম্মাহ সুসংবদ্ধ ও সুসংহত না হয়, সে পর্যন্ত এটা কার্যকর করা সম্ভব নয়। এমতাবস্থায় আপোস-মীমাংসা ও শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করা আপনাদের একান্ত কর্তব্য।

এসব মহান ব্যক্তিও একথা সমর্থন করলেন। হযরত কা'কা (রা) ফিরে গিয়ে আমীরুল মু'মিনীনকে এ সম্পর্কে অবহিত করায় তিনিও বিশেষভাবে সন্তুষ্ট ও আনন্দিত হন এবং সবাই ফিরে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। আর এ প্রান্তরে পরবর্তী তিন দিন পর্যন্ত অবস্থানকালে এমন পরিস্থিতি বিরাজমান ছিল যে, এ সম্পর্কে কারো বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না যে, উভয় পক্ষের মাঝে শান্তিচুক্তি অনুষ্ঠিত হওয়ার ঘোষণা অনতিবিলম্বে প্রচারিত হয়ে যাচ্ছে। চতুর্থ দিন ভোরে হযরত উসমান (রা)-এর হত্যাকারীদের অনুপস্থিতিতে হযরত তালহা ও হযরত যুবায়েরের সাথে আমীরুল মু'মিনীনের সাক্ষাতকারের পর এরূপ ঘোষণা প্রচারিত হতে যাচ্ছিল। কিন্তু এরূপ শান্তি প্রতিষ্ঠা হযরত উসমানের হত্যাকারী দুর্বৃত্তদের মোটেও কাম্য ও মনঃপূত ছিল না। তাই তারা এরূপ পরিকল্পনা গ্রহণ করল যে, তারা প্রথমে হযরত সিদ্দীকা (রা)-র দলের মধ্যে প্রবেশ করে ব্যাপকভাবে হত্যাকাণ্ড ও লুটতরাজ আরম্ভ করবে, যাতে তিনি (হযরত সিদ্দীকা) ও তাঁর সঙ্গীগণ হযরত আলী (রা)-র পক্ষ থেকে বিশ্বাসঘাতকতা ও চুক্তি ভঙ্গ হয়েছে বলে মনে করেন। আর এরা এই ভুল বোঝাবুঝির শিকার হয়ে হযরত আলী (রা)-র সৈন্যবাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। এদের এ চাল ও কূট-কৌশল সফল হল। হযরত আলী (রা)-র বাহিনীভুক্ত দুষ্কৃতকারীদের পক্ষ থেকে যখন হযরত সিদ্দীকা (রা)-র জামাতের উপর আক্রমণ শুরু হল তখন তাঁরা একথা বুঝতে একান্ত বাধ্য ছিলেন যে, এ আক্রমণ আমীরুল মু'মিনীনের সৈন্যবাহিনীর পক্ষ থেকেই হয়েছে। তাই এদের পক্ষ থেকে প্রতি-আক্রমণও আরম্ভ হয়ে গেল। এ পরিস্থিতিতে আমীরুল মু'মিনীন যুদ্ধ ভিন্ন অন্য কোন গতি দেখতে পেলেন না। আর গৃহ-যুদ্ধের যে মর্মন্তুদ ঘটনা হওয়ার ছিল তা হয়ে গেল إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ তাবারী ও অন্যান্য প্রামাণ্য ঐতিহাসিকগণ এ ঘটনা ঠিক এরূপভাবেই হযরত হাসান (রা), হযরত আবদুল্লাহ বিন জাফর (রা), হযরত আবদুল্লাহ্ বিন আব্বাস (রা) প্রমুখ সাহাবায়ে কিরামের রেওয়ায়েত থেকে উদ্ধৃত করেছেন।--- روح المعانى

মোটকথা দুষ্কৃতকারী পাপাচারীদের দুরভিসন্ধি ও কূট-কৌশলের পরিণতিতে সম্পূর্ণ অনিচ্ছাকৃতভাবে নিরপরাধ ও পূত-পবিত্র এ দু'পক্ষের মাঝে যুদ্ধ পর্যন্ত সংঘটিত

হয়ে গেল, কিন্তু ফিতনা ও দুর্যোগ কেটে যাওয়ার পর উভয় মহান ব্যক্তিত্বই অত্যন্ত মর্মাহত ও বিচলিত হন। এ মর্মন্তুদ ঘটনা হযরত সিদ্দীকা (রা)-র স্মরণ হলে তিনি এমন অজস্র ধারায় কাঁদতে থাকতেন যে, তাঁর দোপাট্টা পর্যন্ত অশ্রুসিক্ত হয়ে যেত। অনুরূপভাবে হযরত আলী (রা)-ও এ ঘটনায় বিশেষভাবে মর্মাহত হন। ফিতনা ও দুর্যোগ স্তিমিত হওয়ার পর যখন তিনি নিহতদের লাশ স্বচক্ষে দেখতে তশরীফ নেন তখন নিজ উরুতে হাত মেরে মেরে বলতে লাগলেন যে, যদি এ ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পূর্বেই আমি মৃত্যুবরণ করতাম কতই না ভাল হত।

কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, উম্মুল মু'মিনীন (রা) যখন কোরআনের আয়াত وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ পাঠ করতেন তখন কেঁদে ফেলতেন। ফলে তাঁর দোপাট্টা অশ্রুসিক্ত হয়ে যেত।---(রূহুল মা'আনী)

উল্লিখিত আয়াত পাঠকালে কেঁদে ফেলা এজন্য ছিল না যে, তিনি গৃহে অবস্থানের বিরুদ্ধাচরণ পাপ বলে মনে করতেন অথবা প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে সফর নিষিদ্ধ ছিল। বরং বাড়ি থেকে বের হওয়ার দরুন যে অবাঞ্ছিত ও অনভিপ্রেত হৃদয়-বিদারক ঘটনা সংঘটিত হল তারই পরিপ্রেক্ষিতে স্বভাবত সৃষ্ট সন্তাপ ও মর্মবেদনাই ছিল এর কারণ (এসব রেওয়ায়েত ও যাবতীয় তথ্য তফসীরে রূহুল মা'আনী থেকে সংগৃহীত হয়েছে)।

নবীজীর সহধর্মিণীগণের প্রতি কোরআনের তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম হিদায়ত ঃ وَأَقِمْنَ الصَّلٰوةَ وَآتِينَ الزَّكٰوةَ وَأَطِعْنَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ অর্থাৎ নামায প্রতিষ্ঠা কর, যাকাত প্রদান কর এবং মহান আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সা)-এর অনুসরণ কর। দু'-হিদায়ত সংক্রান্ত বিস্তারিত বিবরণ পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ, পরপুরুষের সাথে বাক্যালাপের সময় আপত্তিকর কোমলতা ও নাজুকতা পরিহার---বিনা প্রয়োজনে গৃহাভ্যন্তর থেকে বের হওয়া এবং এ আয়াতে রয়েছে তিন হিদায়ত। এ হল সর্বমোট পাঁচ হিদায়ত---যা নারীকুল সম্পর্কিত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় বিষয়সমূহের অন্তর্গত।

এ পাঁচ হিদায়তের সব কয়টি সমস্ত মুসলমানগণের প্রতি সমভাবে প্রযোজ্য ঃ উপরোক্ত হিদায়তসমূহের মধ্যে শেষোক্ত তিনটি নবীজীর পুণ্যবতী সহধর্মিণীগণের জন্য নির্দিষ্ট না হওয়া সম্পর্কে তো কারো সন্দেহের অবকাশ নেই। কোন মুসলিম নারী-পুরুষই নামায, যাকাত এবং আল্লাহ্ ও রসূলের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের আওতা -বহির্ভূত নয়। বাকী রইল নারীকুলের পর্দা সংশ্লিষ্ট অবশিষ্ট দু-হিদায়ত। একটু চিন্তা করলে এও পরিষ্কার হয়ে যায় যে, উহাও কেবল নবীজীর পুণ্যবতী স্ত্রীগণের জন্য নির্দিষ্ট নয়---বরং সমস্ত মুসলিম নারীগণের প্রতিও একই হুকুম। এখন কথা হল এসব হিদায়ত বর্ণনার পূর্বেই কোরআনে পাকে বলা হয়েছে যে ঃ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ

مِّنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ অর্থাৎ পুণ্যবতী নবী-পত্নীগণ যদি তাক্ওয়া ধারণ করে তবে তাঁরা অন্যান্য সাধারণ নারীদের ন্যায় নন। এদ্বারা বাহ্যত এ হিদায়তসমূহ নবী-পত্নীগণের জন্যই নির্দিষ্ট বলে মনে হয়। এর স্পষ্ট জওয়াব এই যে, এ নির্দিষ্টকরণ আহ্কামের দিক দিয়ে নয়; বরং এগুলোর উপর আমলের গুরুত্বের উপর নির্ভরশীল অর্থাৎ পুণ্যবতী স্ত্রীগণ অন্যান্য সাধারণ নারীদের ন্যায় নন। বরং এঁদের মর্যাদা-সর্বাধিক উন্নত ও উর্ধ্বতম। সুতরাং যেসব হুকুম সমস্ত নারীকুলের প্রতি ফরয, এগুলোর প্রতি এঁদের সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা উচিত। আল্লাহ্ মহীয়ান গরীয়ানই সর্বাধিক জ্ঞাত।

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে পুণ্যবতী স্ত্রীগণকে সম্বোধন করে যেসব হিদায়ত প্রদান করা হয়েছে, সেগুলো যদিও তাঁদের জন্যে নির্দিষ্ট ছিল না; বরং গোটা উম্মতের প্রতিই এসব হুকুম প্রযোজ্য। কিন্তু পুণ্যবতী স্ত্রীগণকে এজন্য বিশেষভাবে সম্বোধন করা হয়েছে, যাতে তাঁরা নিজেদের মর্যাদা ও নবীগৃহের বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে এসব আমল ও ক্রিয়াকর্মের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। এ আয়াতে এই বিশেষ সম্বোধনের তাৎপর্য বর্ণনা প্রসংগে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্র নিকট আমল (কর্ম) পরিশুদ্ধির বিশেষ হিদায়তের মর্ম ও তাৎপর্য নবীজীর গৃহবাসীগণকে যাবতীয় কলুষতা বিমুক্ত করে দেওয়া رجس শব্দটি আরবী ভাষায় বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। এক জায়গায় رجس প্রতিমা ও বিগ্রহ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। وَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ আবার কখনো নিছক পাপ অর্থে, কখনো আযাব অর্থে, কখনো কলুষতা ও অপবিত্রতা অর্থে ব্যবহৃত হয়। এ আয়াতে এ অর্থই বোঝানো হয়েছে। (বাহরে মুহীত)

আয়াতে আহ্লে বায়তের মর্ম কি? উপরোক্ত আয়াতসমূহে নবী-পত্নীগণকে সম্বোধন করা হয়েছিল বলে স্ত্রীলিঙ্গ বাচক ক্রিয়া ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু এখানে পুণ্যবতী স্ত্রীগণের সাথে সাথে তাঁদের সন্তান-সন্ততি এবং পিতামাতাও আহ্লে বায়তের (أهل بيت) অন্তর্ভুক্ত। সেজন্যই পুংলিঙ্গ পদ عنكم و يطهركم ব্যবহার করা হয়েছে। আবার কোন কোন মুফাস্সিরের মতে আহ্লে বায়ত দ্বারা কেবল নবীজীর পুণ্যবতী স্ত্রীগণকেই বোঝানো হয়েছে। হযরত ইকরামা এবং হযরত মুকাতিল এ মতই পোষণ করেছেন হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত হযরত সাঈদ বিন যুবায়েরের রেওয়ায়েতেও তিনি আহ্লে বায়তের অর্থ পুণ্যবতী স্ত্রীগণ (রা)

وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ বলেই মন্তব্য করেছেন এবং প্রমাণ স্বরূপ এ আয়াত পেশ করেছেন (ইবনে আবী হাতেম ও ইবনে জারীর বর্ণনা করেছেন) এবং পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে نِسَاءَ النَّبِيِّ দিয়ে সম্বোধনও এরই সমর্থন করে। হযরত ইকরামা (রা) তো প্রকাশ্য বাজারে উচ্চৈস্বরে বলতে থাকতেন যে, এ আয়াতে আহলে বায়ত দ্বারা পুণ্যবতী স্ত্রীগণকেই বোঝানো হয়েছে---কেননা এ আয়াত তাঁদের শানেই নাযিল হয়েছে। তিনি বলতেন যে, এ সম্পর্কে আমি মোবাহালা (পুত্র-পরিজনের মাথায় হাত রেখে শপথ) করে বললে বলতেও প্রস্তুত আছি।

কিন্তু হাদীসের বিভিন্ন রেওয়ায়েতে, যেগুলো ইবনে কাসীর এখানে নকল করেছেন---এ কথারই সাক্ষ্য বহন করে যে, হযরত ফাতিমা, হযরত হাসান-হুসায়নও আহলে বায়তের অন্তর্ভুক্ত। যেমন মুসলিম শরীফে হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, একদা হযরত রসূলুল্লাহ্ (সা) বাড়ি থেকে বাইরে তশরীফ নিতে যাচ্ছিলেন। সে সময় তিনি একটি কালো রুমী চাদর জড়ানো ছিলেন। এমন সময় সেখানে হযরত হাসান, হযরত হুসায়ন, হযরত ফাতিমা ও হযরত আলী (রা)---এঁরা সবাই একের পর এক তশরীফ আনেন। নবীজী (সা) এদের সবাইকে চাদরের ভিতরে প্রবেশ করিয়ে নিয়ে আয়াত إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا তিলাওয়াত করেন। আবার কোন কোন রেওয়ায়েতে এরূপ রয়েছে যে, আয়াত তিলাওয়াত করার পর তিনি ফরমান اللهم هؤلاء أهل بيتي (হে আল্লাহ্ এরাই আমার আহ্লে বায়ত।---(ইবনে জারীর)

ইবনে কাসীর এ সম্পর্কে বিভিন্ন হাদীস বর্ণনা করে বলেন যে, প্রকৃত প্রস্তাবে মুফাসসিরগণ প্রদত্ত এসব মতাবলীর মধ্যে পরস্পর কোন বিরোধ নেই। যারা একথা বলেন যে, আয়াত পুণ্যবতী স্ত্রীগণের শানে নাযিল হয়েছে এবং আহ্লে বায়ত বলে তাঁদেরকেই বোঝানো হয়েছে, তাঁদের এ মত অন্যান্যগণও---আহ্লে বায়তের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পরিপন্থী নয়। সুতরাং এটাই ঠিক যে, পুণ্যবতী স্ত্রীগণও আহ্লে বায়তের অন্তর্গত। কেননা, এ আয়াতের শানে নুযূলও এই। শানে নুযূলের মর্ম আয়াতে অন্তর্ভুক্ত হওয়া সম্পর্কে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। আবার নবীজীর ইরশাদ মুতাবিক হযরত ফাতিমা, আলী, হাসান-হুসায়ন (রা)-ও আহ্লে বায়তের অন্তর্গত। আর এ আয়াতের পূর্বে ও পরে উভয় স্থলে نِسَاءَ النَّبِيِّ শিরোনামে

সম্বোধনা করা হয়েছে এবং এজন্য স্ত্রীলিঙ্গবাচক পদ ব্যবহৃত হয়েছে। পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ থেকে আরম্ভ করে শেষ পর্যন্ত সমস্ত পদ স্ত্রীলিঙ্গ রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। আর পরবর্তী পর্যায় وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ-তেও স্ত্রীলিঙ্গ-বিশিষ্ট পদে সম্বোধন করা হয়েছে। এই মধ্যবর্তী আয়াতেও পূর্বাপরের ব্যতিক্রম করে পুংলিঙ্গ পদ عنكم ও يطهركم এর ব্যবহারও একথা বিশেষভাবে প্রমাণ করে যে, এ আয়াতে কেবল নারীগণ অন্তর্ভুক্ত নয়, কিছুসংখ্যক পুরুষও এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

উল্লিখিত আয়াতে لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا দ্বারা স্পষ্টত একথাই বোঝানো হয়েছে যে, এসব হিদায়তের মাধ্যমে আল্লাহ্ পাক আহ্লে বায়তকে শয়তানের প্রতারণা, পাপ-পঙ্কিলতা ও অশ্লীলতাসমূহ থেকে রক্ষা করবেন এবং পবিত্র করে দেবেন। মোটকথা এখানে শরীয়তগত পবিত্র-করণকে বোঝানো হয়েছে। সৃষ্টি ও জন্মগত পবিত্রকরণ, যা নবীগণের বৈশিষ্ট্য তা বোঝানো হয়নি। কিন্তু এদ্বারা এ কথা বোঝা যায় না যে, এরা সব নিষ্পাপ; এবং নবীগণ (সা)-এর ন্যায় তাঁদের দ্বারা কোন পাপ সংঘটিত হওয়া সম্ভবপরই নয়। জন্মগত শুদ্ধাচারিতা ও পবিত্রতার যা বৈশিষ্ট্য---সে সম্পর্কে শিয়া সম্প্রদায় সংখ্যাগরিষ্ঠ উম্মতের থেকে ভিন্নমত পোষণ করে প্রথমত আহ্লে বায়ত শব্দ কেবল রসূলের সন্তান-সন্ততিদের জন্যই নির্দিষ্ট বলে এবং পুণ্যবতী স্ত্রীগণ এঁদের থেকে বহির্ভূত বলে দাবি করেছে। দ্বিতীয়ত উল্লিখিত আয়াতে পবিত্রকরণ অর্থ তাঁদের জন্মগত নিষ্কলুষতা বলে মন্তব্য করে আহ্লে বায়তকে নবীগণের ন্যায় সম্পূর্ণ নিষ্পাপ বলে আখ্যায়িত করেছে। এর উত্তর এবং মাস'আলার বিস্তারিত বর্ণনা আহ্কামুল কোরআন নামক গ্রন্থে সূরায়ে আহ্যাব অধ্যায়ে প্রদান করেছি, যাতে নিষ্কলুষতার সংজ্ঞা এবং তা নবী ও ফেরেশতাকুলের জন্য নির্দিষ্ট থাকা এবং তাঁরা ব্যতীত অন্যকেও নিষ্পাপ না হওয়ার কথা শরয়ী প্রমাণাদিসহ সবিস্তার বর্ণনা করেছি। বিদগ্ধ সমাজ তা দেখে নিতে পারেন---সাধারণ লোকের জন্য তা নিষ্প্রয়োজন।

اٰيٰتِ اللّٰهِ---وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ وَالْحِكْمَةِ

অর্থ কোরআন আর حكمت অর্থ রসূলুল্লাহ্ (সা) প্রদত্ত শিক্ষা-দীক্ষা এবং তাঁর সুন্নত ও আদর্শ। যেমন অধিকাংশ তফসীরকার حكمت এর তফসীর সুন্নত বলে বর্ণনা করেছেন। اذكرن শব্দের দুটি ভাবার্থ হতে পারে---(১) এসব বিষয় স্বয়ং

স্মরণ রাখা---যার ফলশ্রুতি ও পরিচয় হলো এগুলোর উপর আমল করা। (২) কোরআন পাকের যা কিছু তাঁদের গৃহে তাঁদের সামনে নাযিল হয়েছে বা রসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁদেরকে যেসব শিক্ষা প্রদান করেছেন, উম্মতের অন্যান্য লোকদের সঙ্গে সেসবের আলোচনা করা এবং তাদেরকে সেগুলো পৌঁছে দেওয়া।

ফায়দা ঃ ইবনে আরাবী আহ্কামুল-কোরআন নামক গ্রন্থে লিখেছেন যে, এ আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, যদি কোন ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ (সা)-র নিকট থেকে কোন আয়াতে কোরআন বা হাদীস শুনে তবে তা অন্যান্য লোকের নিকট পৌঁছে দেওয়া তার অবশ্য কর্তব্য। এমনকি কোরআনের যেসব আয়াত নবীজীর পুণ্যবতী স্ত্রীগণের গৃহে নাযিল হয়েছে অথবা নবীজী (সা)-র নিকট থেকে তাঁরা যেসব শিক্ষা লাভ করেছেন, সেগুলো সম্পর্কে অপর লোকের সাথে আলোচনা করা তাঁদের উপরও বাধ্যতামূলক করে দেওয়া হয়েছে। আর আল্লাহ্ পাকের এ আমানত উম্মতের অপরাপর লোকদের নিকট পৌঁছানো তাঁদের (পুণ্যবতী স্ত্রীগণের) অপরিহার্য কর্তব্য।

কোরআনের ন্যায় হাদীসের সংরক্ষণ ঃ এ আয়াতে যেরূপভাবে আয়াতে-কোরআনের প্রচার-প্রসার ও শিক্ষা প্রদান উম্মতের জন্য বাধ্যতামূলক করে দেওয়া হয়েছে, অনুরূপভাবে হিকমত (حكمت) শব্দের মাধ্যমে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র হাদীসসমূহের প্রচার এবং শিক্ষা প্রদানও বাধ্যতামূলক করে দেওয়া হয়েছে। এ কারণেই সাহাবায়ে কিরাম (রা) সর্বাবস্থায়ই এ নির্দেশ পালন করেছেন। সহীহ্ বুখারী শরীফে হযরত মা'আয (রা) সম্পর্কেও এরূপ ঘটনা বর্ণিত আছে যে, তিনি রসূলুল্লাহ্ (সা)-র নিকট থেকে একখানা হাদীস শুনেন, কিন্তু জনগণ এর প্রতি যথাযথ মর্যাদা আরোপ না করতে পারে অথবা কোন ভুল বোঝাবুঝিতে পতিত হতে পারে এরূপ আশংকা করে তিনি তা সর্বসাধারণের সামনে বর্ণনা করেন নি। কিন্তু যখন তাঁর (মা'আযের) মৃত্যুক্ষণ ঘনিয়ে এলো, তখন তিনি জনগণকে একত্রিত করে তাদের সামনে সে হাদীস পেশ করলেন এবং বললেন যে, নিছক ধর্মীয় স্বার্থে আমি এ যাবত এ সম্পর্কে কারো সাথে আলোচনা করিনি। কিন্তু এক্ষণে আমার মৃত্যু অত্যাসন্ন। সুতরাং উম্মতের এ আমানত তাদের হাতে পৌঁছিয়ে দেওয়া একান্ত কর্তব্য বলে মনে করি। হযরত মা'আয হাদীসে-রসূল উম্মতের নিকট না পৌঁছানোর পাপে যাতে পতিত না হন সেজন্য তিনি মৃত্যুর পূর্বেই জনগণকে ডেকে এ হাদীস শুনিয়ে দেন।

এ ঘটনাও এ সাক্ষ্যই প্রদান করে যে, সমস্ত সাহাবায়ে কিরামই কোরআনের এ হুকুম পালন ওয়াজিব ও অবশ্যকরণীয় বলে মনে করতেন। আর সাহাবায়ে কিরাম অত্যন্ত সতর্কতার সাথে হাদীসসমূহ জনগণের নিকট পৌঁছাবার ব্যবস্থা করতেন বলে হাদীস সংরক্ষণের গুরুত্ব কোরআনের কাছাকাছি হয়ে পড়লো। এ সম্পর্কে সন্দেহের অবতারণা করা কোরআনে পাকে সন্দেহের অবতারণা করারই নামান্তর।

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ
وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ
وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ
وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا
وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿٣٥﴾

(৩৫) নিশ্চয় মুসলমান পুরুষ, মুসলমান নারী ঈমানদার পুরুষ, ঈমানদার নারী অনুগত পুরুষ, অনুগত নারী, সত্যবাদী পুরুষ, সত্যবাদী নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ, ধৈর্যশীল নারী, বিনীত পুরুষ, বিনীত নারী, দানশীল পুরুষ, দানশীল নারী, রোযা পালনকারী পুরুষ, রোযা পালনকারী নারী, যৌনাঙ্গ হিফাযতকারী পুরুষ, যৌনাঙ্গ হিফাযতকারী নারী, আল্লাহ্‌র অধিক যিকিরকারী পুরুষ ও যিকিরকারী নারী---তাদের জন্য আল্লাহ্ প্রস্তুত রেখেছেন ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

নিঃসন্দেহে ইসলামের কার্যাবলী সম্পন্নকারী পুরুষগণ, ইসলামের কার্যাবলী সম্পন্নকারিণী নারীগণ, ঈমান আনয়নকারী পুরুষগণ ও ঈমান আনয়নকারিণী নারীগণ (مسلمات ও مسلمين এর এই তফসীরের পরিপ্রেক্ষিতে ইসলামের মর্মার্থ দীন সংশ্লিষ্ট কার্যাবলী---যথা নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত প্রভৃতি এবং مؤمنات ও مؤمنين এর অন্তর্গত ঈমানের অর্থ আকীদা-বিশ্বাসসমূহ। যেরূপ হযরত জিবরাঈল (আ)-এর জিজ্ঞাসার পরিপ্রেক্ষিতে হযরত (সা)-ও ইসলাম এবং ঈমান সম্পর্কে এরূপ উত্তর দিয়েছেন বলে সহীহ্ বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে।) আনুগত্য স্বীকারকারী পুরুষ, আনুগত্য স্বীকারকারিণী নারীগণ, সত্যপরায়ণ পুরুষ ও সত্যপরায়ণা নারীগণ, (কথায় সত্যপরায়ণ, কাজে-কর্মে সত্যপরায়ণ এবং ঈম'ন ও নিয়তে সত্যপরায়ণ---এরা সবাই এ সত্য পারায়ণতার অন্তর্গত। অর্থাৎ এঁদের কথাবার্তায় মিথ্যার লেশমাত্র নেই, কাজে-কর্মে কোন প্রকারের শৈথিল্য ও অনাসক্তি নেই এবং লোক দেখানোর মন-মানসিকতা এবং কপটতাও নেই) এবং ধৈর্য ধারণকারী পুরুষ ও ধৈর্য ধারণকারিণী নারীগণ (সকল প্রকারের ধৈর্যই-এর অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ উপাসনা-আরাধনায় অটল ও দৃঢ়পদ থাকা, পাপ-পঙ্কিলতা থেকে নিজকে মুক্ত রাখা এবং বিপদে-আপদে ধৈর্য ধারণ করা) এবং বিনয়ী পুরুষ ও বিনয়ী নারীগণ, (নামায ও অন্যান্য ইবাদতে বিনয় এবং একাগ্রতাও

খুশুর অন্তর্ভুক্ত। যেন অন্তরও ইবাদতমুখী থাকে এবং অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও অনুরূপ থাকে। অহঙ্কার ও আত্মম্ভরিতার বিপরীত সাধারণ বিনয়-নম্রতাও এর অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ এরা গর্ব ও আত্মাভিমান থেকে মুক্ত আর নামায ও অন্যান্য ইবাদতে নম্রতা---একাগ্রতা তাদের অবিচ্ছিন্ন গুণ ও সাধারণ বৈশিষ্ট্য।) এবং দানশীল পুরুষ ও দানশীলা নারীগণ (যাকাত ও অন্যান্য নফল দান-খয়রাত প্রভৃতি সবই এর অন্তর্গত) আর রোযাদার পুরুষ ও রোযাদার নারীগণ, স্বীয় গুপ্তাংগ সংরক্ষণকারী পুরুষ ও গুপ্তাঙ্গ সংরক্ষণকারিণী নারীগণ এবং অধিক পরিমাণে আল্লাহ্‌কে স্মরণকারী পুরুষ ও স্মরণকারিণী নারীগণ (অর্থাৎ যারা ফরয যিকিরসমূহের সাথে সাথে নফল যিকিরসমূহ আদায় করে) এদের জন্য আল্লাহ্ পাক ক্ষমা ও মহান প্রতিদান তৈরী করে রেখেছেন।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

কোরআনে পাকে সাধারণভাবে পুরুষদেরকে সম্বোধন করে নারীদেরকে আনুষঙ্গিকভাবে তার অন্তর্ভুক্ত করে দেওয়ার তাৎপর্যঃ যদিও নারী-পুরুষ উভয়ই কোরআনে পাকের সাধারণ নির্দেশাবলীর আওতাধীন, কিন্তু সাধারণত সম্বোধন করা হয়েছে পুরুষদেরকে। আর নারীজাতি পরোক্ষভাবে এর অন্তর্গত। সর্বত্র يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا শব্দ-সমষ্টি ব্যবহার করে আনুষঙ্গিকভাবে নারীদেরকেও সম্বোধনের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এতে এ ইঙ্গিতই রয়েছে যে, নারীদের সকল বিষয়ই প্রচ্ছন্ন ও গোপনীয়। এর মধ্যেই তাদের মান-মর্যাদা নিহিত। বিশেষ করে সমস্ত কোরআনে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে দেখা যাবে যে, কেবল হযরত মরিয়ম বিন্‌তে ইমরান ব্যতীত অন্য কোন স্ত্রীলোকের নাম কোরআনে পাকে উল্লেখ নেই। যেখানে তাদের প্রসংগ এসেছে সেখানে পুরুষের সাথে তাদের সম্পর্কসূচক শব্দ যথা امرأة فرعون ও امرأة نوح প্রভৃতি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। হযরত মরিয়মের বিশেষত্ব সম্ভবত এই যে, কোন পিতার সাথে হযরত ঈসা (আ)-র সম্পর্ক স্থাপন সম্ভবপর ছিল না। তাই মায়ের সাথেই তাঁকে সম্পর্কযুক্ত করতে হয়েছিল এবং এ কারণেই তাঁর (মরিয়মের) নাম উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ্ পাকই সর্বাধিক জ্ঞাত।

কোরআন করীমের এই প্রকাশভংগী যদিও এক বিশেষ প্রজ্ঞা, যৌক্তিকতা ও মঙ্গলের ভিত্তিতেই অনুসৃত হয়েছিল, কিন্তু এ পরিপ্রেক্ষিতে নারীগণের হীনমন্যতাবোধের উদ্রেক হওয়া একান্ত স্বাভাবিক ছিল। তাই বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থে এমন বহু রেওয়ায়েতে রয়েছে, যাতে নারীগণ রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খিদমতে এ মর্মে আরয করেছে যে, আমরা দেখতে পাচ্ছি---আল্লাহ্ পাক কোরআনের সর্বত্র পুরুষদেরই উল্লেখ করেছেন এবং তাদেরকেই সম্বোধন করেন। এ দ্বারা বোঝা যায় যে, আমাদের (নারীদের) মাঝে কোন প্রকার পুণ্য ও কল্যাণই নিহিত নেই। সুতরাং আমাদের কোন ইবাদতই গ্রহণযোগ্য নয় বলে আশংকা হচ্ছে। (পুণ্যবতী স্ত্রীগণ থেকে ইমাম বাগবী রেওয়ায়েত

করেছেন) এবং তিরমিযী শরীফে হযরত উম্মে আম্মারা থেকে, আবার কোন কোন রেওয়ায়েতে হযরত আস্‌মা বিনতে উমায়েস (রা) থেকেও এ ধরনের আবেদন উপস্থাপনের কথা বর্ণিত আছে--আর এসব রেওয়ায়েতে এ আবেদন উপরোল্লিখিত আয়াতসমূহ নাযিল হওয়ার কারণ বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে।

উল্লিখিত আয়াতসমূহে নারীদেরকে স্বস্তি ও সান্ত্বনা প্রদান এবং তাদের আমল গ্রহণযোগ্য হওয়ার শর্তাবলী সংশ্লিষ্ট বিশেষ আলোচনা রয়েছে। বলা হয়েছে, আল্লাহ্ পাক সমীপে মানমর্যাদা ও তাঁর নৈকট্য লাভের ভিত্তি হল সৎ-কার্যাবলী, আল্লাহ্‌র আনুগত্য ও বশ্যতা স্বীকার। এ ক্ষেত্রে নারীপুরুষের মাঝে কোন ভেদাভেদ নেই।

অধিক পরিমাণে আল্লাহ্‌র যিকিরের নির্দেশ এবং তার যৌক্তিকতা ও তাৎপর্য ঃ ইসলামের স্তম্ভ পাঁচ প্রকারের ইবাদত। যথা---নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ও জিহাদ। কিন্তু সমস্ত কোরআনে এর মধ্য থেকে কোন ইবাদত অধিক পরিমাণে করার নির্দেশ নেই। কিন্তু কোরআনে পাকের বহু সংখ্যক আয়াতে আল্লাহ্‌র যিকির অধিক পরিমাণে করার নির্দেশ রয়েছে। সূরায়ে আনফাল, সূরায়ে জুম'আ এবং এই সূরায় وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ (অধিক পরিমাণে আল্লাহ্‌কে স্মরণ-কারিগণ ও স্মরণকারিণীগণ) বলা হয়েছে। এর তাৎপর্য সম্ভবত এই যে প্রথমত আল্লাহ্‌র যিকির সকল ইবাদতের প্রকৃত রূহ। হযরত মা'আয বিন্ আনাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, জনৈক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ (সা)-র নিকট জিজ্ঞেস করল যে, মুজাহিদ-গণের মাঝে সর্বাধিক প্রতিদান ও সওয়াবের অধিকারী কোন্ ব্যক্তি হবে? তিনি (সা) বললেন, যে সবচেয়ে বেশি আল্লাহ্‌র যিকির করবে। অতপর জিজ্ঞেস করল যে, রোযাদারদের মধ্যে সর্বোচ্চ সওয়াবের অধিকারী কে হবে? তিনি বললেন, যে আল্লাহ্‌র যিকির সবচেয়ে বেশি করবে। এরূপভাবে নামায, যাকাত, হজ্জ, সদ্‌কা প্রভৃতি সম্পর্কেও জিজ্ঞেস করল। তিনি প্রতিবার এ উত্তরই দিলেন যে, যে ব্যক্তি সর্বাধিক পরিমাণে আল্লাহ্‌র যিকির করবে, সে-ই সর্বোচ্চ প্রতিদান লাভ করবে (ইবনে কাসীর থেকে আহমদ বর্ণনা করেছেন)।

দ্বিতীয়ত, যাবতীয় ইবাদতের মধ্যে এটাই (যিকির) সহজতর। এটা আদায় করা সম্পর্কে শরীয়তও কোন শর্ত আরোপ করেনি---ওযুসহ বা বিনা ওযুতে উঠতে-বসতে চলতে-ফিরতে সব সময়ে আল্লাহ্‌র যিকির করা যায়। এর জন্য মানুষের কোন পরিশ্রমই করতে হয় না. কোন অবসরেরও প্রয়োজন নেই। কিন্তু এর লাভ ও ফলশ্রুতি এত বেশি ও ব্যাপক যে, আল্লাহ্‌র যিকিরের মাধ্যমে পার্থিব কাজকর্ম ও দীন (ধর্ম) ইবাদতে রূপান্তরিত হয়। আহার গ্রহণের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী দোয়া; বাড়ি থেকে বের হওয়ার ও ফিরে আসার দোয়া, সফরে রওয়ানা করা ও সফরকালীন বাড়ি

ফিরে আসার দোয়া, কোন কারবারের সূচনাপর্বে ও শেষে রসূলুল্লাহ্ (সা) নির্দেশিত দোয়া---প্রভৃতি দোয়ার সারমর্ম এই যে, মুসলমান যেন কোন সময়েই আল্লাহ্ সম্পর্কে অমনোযোগী ও গাফিল থেকে কোন কাজ না করে, আর তাঁরা যদি সকল কাজকর্মে এ নির্ধারিত দোয়াসমূহ পড়ে নেয় তবে পার্থিব কাজ দীনে (ধর্মে) পর্যবসিত হয়ে যায়।

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗٓ أَمْرًا أَنْ يَّكُوْنَ
لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا
مُّبِيْنًا ﴿٣٦﴾ وَإِذْ تَقُوْلُ لِلَّذِيْٓ أَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ
عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللّٰهَ وَتُخْفِيْ فِيْ نَفْسِكَ مَا اللّٰهُ مُبْدِيْهِ وَتَخْشَى
النَّاسَ ۚ وَاللّٰهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشٰهُ ۗ فَلَمَّا قَضٰى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنٰكَهَا
لِكَيْ لَا يَكُوْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ حَرَجٌ فِيْٓ أَزْوَاجِ أَدْعِيَآئِهِمْ إِذَا قَضَوْا
مِنْهُنَّ وَطَرًا ۗ وَكَانَ أَمْرُ اللّٰهِ مَفْعُوْلًا ﴿٣٧﴾ مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ
فِيْمَا فَرَضَ اللّٰهُ لَهٗ ۗ سُنَّةَ اللّٰهِ فِي الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ ۗ وَكَانَ
أَمْرُ اللّٰهِ قَدَرًا مَّقْدُوْرًا ﴿٣٨﴾ الَّذِيْنَ يُبَلِّغُوْنَ رِسٰلٰتِ اللّٰهِ وَ
يَخْشَوْنَهٗ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللّٰهَ ۗ وَكَفٰى بِاللّٰهِ حَسِيْبًا ﴿٣٩﴾

(৩৬) আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল কোন কাজের আদেশ করলে কোন ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন ক্ষমতা নেই যে, আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের আদেশ অমান্য করে, সে প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতায় পতিত হয়। (৩৭) আল্লাহ্ যাকে অনুগ্রহ করেছেন; আপনিও যাকে অনুগ্রহ করেছেন; তাকে যখন আপনি বলেছিলেন, তোমার স্ত্রীকে তোমার কাছেই থাকতে দাও এবং আল্লাহ্কে ভয় কর। আপনি অন্তরে এমন বিষয় গোপন করছিলেন, যা আল্লাহ্ পাক প্রকাশ করে দেবেন। আপনি লোকনিন্দার ভয় করছিলেন; অথচ আল্লাহ্কেই অধিক ভয় করা উচিত! অতপর যায়েদ যখন যয়নবের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করল, তখন আমি তাকে আপনার সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করলাম, যাতে মু'মিনদের পোষ্যপুত্ররা তাদের স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করলে সেসব

স্ত্রীকে বিবাহ করার ব্যাপারে মু'মিনদের কোন অসুবিধা না থাকে। আল্লাহ্‌র নির্দেশ কার্যে পরিণত হয়েই থাকে। (৩৮) আল্লাহ্‌ নবীর জন্য যা নির্ধারিত করেন, তা করতে তাঁর কোন বাধা নেই। পূর্ববর্তী নবীগণের ক্ষেত্রে এটাই ছিল আল্লাহ্‌র চিরাচরিত বিধান। আল্লাহ্‌র আদেশ নির্ধারিত, অবধারিত। (৩৯) সেই নবীগণ আল্লাহ্‌র পয়গাম প্রচার করতেন ও তাঁকে ভয় করতেন। তাঁরা আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কাউকে ভয় করতেন না। হিসাব গ্রহণের জন্য আল্লাহ্‌ যথেষ্ট।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

কোন মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীর পক্ষে সম্ভব নয় যে--যখন আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসূল (সা) কোন কাজের (তা পার্থিব কাজই হোক না কেন---অবশ্য করণীয় বলে) নির্দেশ প্রদান করেন, তখন সেকাজে সেসব মু'মিনগণের কোন অধিকার অবশিষ্ট থাকে (অর্থাৎ ইচ্ছানুযায়ী করার বা না করার) অধিকার থাকে না। বরং তা কার্যে পরিণত করাই ওয়াজিব ও বাধ্যতামূলক হয়ে যায় আর যে ব্যক্তি (এরূপ বাধ্যতামূলক নির্দেশের পর) আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসূল (সা)-এর কথা অমান্য করে, সে স্পষ্ট পথভ্রষ্টতায় পতিত হল। আর (সে সময়ের কথা স্মরণ করুন) যখন আপনি (উপদেশ ও পরামর্শছলে) ঐ ব্যক্তিকে বলতে ছিলেন, যার প্রতি আল্লাহ্‌ অনুগ্রহ করেছেন; (যথা ইসলাম গ্রহণের তওফিক দিয়েছেন--যা দীনী অনুগ্রহ এবং দাসত্ব থেকে মুক্তি দিয়েছেন---যা পার্থিব অনুগ্রহ) এবং আপনিও যার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন (দীনী শিক্ষা প্রদান করেছেন এবং মুক্ত করে দিয়েছেন; অতপর ফুফাত বোনের সাথে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করে দিয়েছেন অর্থাৎ যায়েদ বিন হারিসা, যাকে তিনি বোঝাচ্ছিলেন) যে, তুমি নিজ স্ত্রীকে (যয়নব) তোমার বিবাহাধীনে থাকতে দাও (এবং তার সাধারণ ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলো ধরতে যেও না---অন্যথায় তোমাদের মাঝে গরমিল ও সামঞ্জস্যের অভাব পরিলক্ষিত হতে পারে।) এবং আল্লাহ্‌কে ভয় কর। (আর তার সাধারণ অধিকারসমূহ আদায়ে শৈথিল্য প্রদর্শন করো না, অন্যথায় তা সামঞ্জস্যহীনতার উদ্রেক করে) এবং (যখন অভিযোগসমূহ সীমা অতিক্রম করে গেল ---আকার ইঙ্গিতে সংশোধন ও সামঞ্জস্য বিধানের আশা আর অবশিষ্ট রইল না, তখন মুখে বলারই আশ্রয় নেওয়া হল) আপনি নিজ অন্তরে সে কথা গোপন রাখছিলেন, যা আল্লাহ্‌ তা'আলা (পরিশেষে) প্রকাশ করার ছিলেন [এর অর্থ হযরত যয়নবের সাথে তাঁর (সা) বিয়ে--যখন হযরত যায়েদ তাকে তালাক দিয়ে দেবেন, যা আল্লাহ্‌ পাক زَوَّجْنَكَهَا -এর সাহায্যে কথার মাধ্যমে এবং স্বয়ং বিয়ের মাধ্যমে প্রকাশ করছেন] এবং (এই শর্তসাপেক্ষ ইচ্ছার সাথে সাথে) আপনি মানুষের (রটানো দুর্নামের) ভয় ও আশংকা করছিলেন। (কেননা সে সময় পর্যন্ত সম্ভবত এই বিয়ের মাঝে নিহিত গুরুত্বপূর্ণ দীনী কল্যাণ ও মঙ্গলের কথা তাঁর মনে উদিত হয়নি। হযরত যয়নবের খেয়ালে কেবল পার্থিব বিশেষ মঙ্গলের কথাই ছিল এবং পার্থিব

বিষয়ে এরূপ আশংকা ক্ষতিকর নয়। বরং কোন কোন ক্ষেত্রে কাম্যও বটে। যখন প্রশ্ন তুললে অপরের ধর্মীয় ক্ষতি ও অমঙ্গলের আশংকা থাকে এবং তাদেরকে এ থেকে অব্যাহতি দেওয়া উদ্দেশ্য হয়।) আর আপনার পক্ষে আল্লাহ্ পাকই তো ভয় করার অধিকতর যোগ্য (অর্থাৎ) যেহেতু প্রকৃত প্রস্তাবে এতে ধর্মীয় মঙ্গল বিদ্যমান। যেমন পরবর্তী لِكَيْ لَا يَكُونَ الخ তে উল্লেখ রয়েছে। সুতরাং সৃষ্টিকুল থেকে কোন আশংকা করবেন না। বস্তুত ধর্মীয় মঙ্গল সম্পর্কে অবহিত হওয়ার পর তিনি আর কোন প্রকারের আশংকা করেন নি, যার বর্ণনা পরবর্তী পর্যায়ে রয়েছে। অতপর যখন তাঁর (যয়নব) থেকে যায়েদের মন উঠে গেল (অর্থাৎ অভ্যন্তরীণ গরমিল ও বনিবনা না হওয়ার দরুন তালাক দিয়ে দিল এবং ইদ্দতও অতিবাহিত হয়ে গেল, তখন) আমি আপনাকে তাঁর সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করে দিলাম, যাতে মুসলমানদের মধ্যে নিজেদের পোষ্যপুত্রদের স্ত্রীদের (বিয়ে) সম্পর্কে কোন সংকীর্ণতা না থাকে; যখন তারা (পোষ্যপুত্রগণ) এদের প্রতি অনাসক্ত ও বিরাগী হয়ে পড়ে (ও তালাক দিয়ে দেয়। মোটকথা শরীয়তের এ নির্দেশ প্রকাশ করাই উদ্দেশ্য ছিল।) আর আল্লাহ্র এ নির্দেশ তো প্রকাশ পাওয়ারই ছিল। (কেননা যুক্তি এটাই চাচ্ছিল। পরবর্তী পর্যায়ে অপবাদের জওয়াব দেওয়া হচ্ছে, বলা হচ্ছে যে,) এ নবীর জন্য আল্লাহ্ পাক যে বিষয় (পার্থিবভাবে বা শরীয়তগতভাবে) নির্ধারিত করে দিয়েছেন সে সম্পর্কে নবীর উপর কোন দোষারোপ (এবং অপবাদ) নেই। যেসব (নবী) অতীত হয়ে গেছেন তাঁদের জন্যও আল্লাহ্ পাক এ রীতিই নির্ধারিত করে রেখেছেন (অর্থাৎ তাঁরা যেসব কাজের অনুমতি পেতেন নিঃসংকোচে তা সম্পন্ন করে ফেলতেন। এতে তারা দুর্নাম ও অপবাদের লক্ষ্যস্থলে পরিণত হন নি। অনুরূপভাবে এ নবীও প্রশ্নের লক্ষ্যস্থলে পরিণত হন নি) এবং (সেসব পয়গম্বর কর্তৃকও) এ ধরনের যত কাজ সাধিত হয় (সেগুলো সম্পর্কেও) আল্লাহ্র হুকুম (পূর্ব হতেই) নির্ধারিত হয়ে থাকে।

(এবং তদনুসারেই তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয় এবং তাঁরা আমল করেন। তাঁর অর্থাৎ নবীজীর ঘটনা মাঝে এ বিষয়ের অবতারণা, পুনরায় নবীগণের আলোচনার মধ্যে একে পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করা--সম্ভবত এ ইঙ্গিতই প্রদান করে যে, এসব বস্তু অন্যান্য যাবতীয় সৃষ্ট পার্থিব বস্তুসমূহের ন্যায় এমন হিকমত বিশিষ্ট ও তাৎপর্য সম্বলিত যে--তা পূর্ব থেকেই আল্লাহ্র ইলমে নির্ধারিত ও সাব্যস্ত হয়ে থাকে। সুতরাং এ বিষয়ে নবীকে অপবাদ ও ভর্ৎসনা দেওয়া যেন আল্লাহ্কে অপবাদ দেওয়া। পক্ষান্তরে যে সব বিষয় ও কার্যাদি সম্পর্কে হক তা'আলা স্বয়ং ভর্ৎসনা ও নিন্দাবাদ জ্ঞাপন করবেন---যদিও সেগুলো পূর্বনির্ধারিত বলে অবশ্যই হিকমত বিশিষ্ট; কিন্তু তা ভর্ৎসনাস্থল ও শাস্তিযোগ্য হওয়া, এ কথাই প্রমাণ করে যে, সেগুলো অপকৃষ্টতা ও পাপ-পঙ্কিলতার উপাদান সম্বলিত। সুতরাং এ অপকৃষ্টতা ও পাপ-পঙ্কিলতার পরিপ্রেক্ষিতে এসব কাজ ও বিষয়ের জন্য নিন্দাবাদ ও শাস্তিবিধান জায়েয। পরবর্তী পর্যায়ে নবীজীকে সান্ত্বনা প্রদানের উদ্দেশ্যে ওসব মহান পয়গম্বরের এক বিশেষ প্রশংসা বিবৃত হয়েছে। অর্থাৎ) এসব (অতীত কালের পয়গম্বরগণ) এমন ছিলেন

যে, আল্লাহ্ তা'আলার হুকুমসমূহ পৌঁছাতেন (যদি মৌখিকভাবে পৌঁছাতে নির্দেশিত হতেন তবে মৌখিকভাবে আর যদি কর্মের মাধ্যমে পৌঁছাতে নির্দেশিত হতেন তবে কর্মের মাধ্যমে) এবং (এ পর্যায়ে) আল্লাহ্কেই ভয় করতেন; এবং আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাউকে ভয় করতেন না। [সুতরাং তিনি এ বিয়ে তাবলীগে ফেলী অর্থাৎ কাজের মাধ্যমে আল্লাহ্র নির্দেশ পৌঁছানো বলে অবহিত না হওয়া পর্যন্ত এরূপ আশংকিত হওয়া দোষের নয়। কিন্তু এখন যেহেতু আপনি এ সম্পর্কে জ্ঞাত হয়েছেন, সুতরাং পুনরায় এরূপ আশংকা করবেন না---রিসালতের পদমর্যাদা এরূপ হওয়াই দাবি করে। বস্তুত এ কথা প্রকাশিত হওয়ার পর তিনি আর এরূপ আশংকা করেন নি। যদিও আল্লাহ্র নির্দেশাবলী পৌঁছানোর ক্ষেত্রে তিনি কাউকে ভয় করতেন না---বস্তুত এর সম্ভাবনাও ছিল না। তবুও নবী (আ) গণের ঘটনার উল্লেখ---একান্তভাবে হৃদয়ে অধিক শক্তি ও সাহস সঞ্চারের উদ্দেশ্যে এবং তাঁকে অধিক সান্ত্বনা প্রদানের উদ্দেশ্যে ফরমান যে, আমলসমূহের] হিসাব-নিকাশ গ্রহণের জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট। (সুতরাং অপর কাউকে ভয় করা কেন:---তাঁর প্রতি ভর্ৎসনাকারীকেও আল্লাহ্ পাক শাস্তি প্রদান করবেন। আপনি এ অপবাদ ও ভর্ৎসনার দরুন বিচলিত ও সন্তাপগ্রস্ত হবেন না)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এ কথা পূর্বে কয়েকবার উল্লেখ করা হয়েছে যে, সূরায়ে আহযাবের অধিকাংশ আহকামই রসূলুল্লাহ্ (সা)-র প্রতি ভালবাসা, সম্মান ও পূর্ণ আনুগত্য প্রদর্শন সংশ্লিষ্ট অথবা তাঁকে দুঃখ-যন্ত্রণা পৌঁছানো নিষিদ্ধ হওয়া সম্পর্কিত।

উপরোল্লিখিত আয়াতসমূহও এ সম্পর্কিত কয়েকটি ঘটনা প্রসংগেই নাযিল হয়েছে।

এক ঘটনা এই যে, হযরত যায়েদ বিন্ হারিসা (রা) এক ব্যক্তির ক্রীতদাস ছিলেন। অজ্ঞতার যুগে রসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে অতি অল্প বয়সে 'ওকায' নামক বাজার থেকে খরিদ করে এনে মুক্ত করে দেন। আর আরব দেশের প্রথানুযায়ী তাঁকে পোষ্য পুত্রের গৌরবে ভূষিত করে লালন-পালন করেন। মক্কাতে তাঁকে 'মুহম্মদ (সা)-এর পুত্র যায়েদ' নামে সম্বোধন করা হত। কোরআনে করীম এটাকে অজ্ঞতার যুগের ভ্রান্ত রীতি আখ্যায়িত করে তা নিষিদ্ধ করে দেয় এবং পোষ্য পুত্রকে তার প্রকৃত পিতার সাথে সম্পর্কযুক্ত করতে নির্দেশ দেয়। এ প্রসঙ্গেই এ সূরার প্রথমাংশের আয়াতসমূহ ادعوهم لآبائهم الآية নাযিল হয়েছে। এসব হুকুম নাযিল হওয়ার পর সাহাবায়ে কিরাম (রা) যায়েদ বিন্ মুহাম্মদ (সা) নামে ডাকা পরিহার করেন এবং তাঁর পিতা হারিসার সাথে সম্পর্কযুক্ত করতে থাকেন।

একটি সূক্ষ্ম কথা: সমগ্র কোরআনে নবী (সা)-গণ ব্যতীত কোন শ্রেষ্ঠ বিশিষ্টতম সাহাবীর নামেরও উল্লেখ নেই। একমাত্র যায়েদ বিন্ হারিসা (রা)-র নাম রয়েছে। কোন

কোন মহাত্মা এর তাৎপর্য এটাই বর্ণনা করেছেন যে, কোরআনের নির্দেশানুসারে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সাথে তাঁর পুত্রত্বের সম্পর্ক ছিন্ন করে দেওয়ার ফলে এক বিশেষ সম্মান থেকে বঞ্চিত হন। আল্লাহ্ পাক কোরআনে করীম তাঁর নাম অন্তর্ভুক্ত করে এর বিনিময় প্রদান করেছেন। যায়েদ শব্দটি কোরআনে করীমের একটি শব্দ হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে হাদীসের মর্মানুসারে এর প্রতিটি অক্ষর পাঠের বিনিময়ে আমলনামায় দশ দশ নেকী লিপিবদ্ধ হয়। কোরআনে পাকে কেবল তাঁর নাম পাঠ করলে পর ত্রিশ নেকী লাভ করা যায়।

রসূলুল্লাহ্ (সা) ও তাঁর প্রতি বিশেষ মর্যাদা প্রদর্শন করতেন। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) ফরমান যে, যখনই তিনি (সা) তাঁকে কোন সৈন্যবাহিনীভুক্ত করে পাঠিয়েছেন---তাকেই সেনাপতি নিযুক্ত করেছেন।---(ইবনে কাসীর)

বিশেষ জ্ঞাতব্যঃ ইসলামে এই ছিল গোলামির মর্মার্থ---শিক্ষা-দীক্ষা প্রদানের পর যারা যোগ্য প্রতিপন্ন হয়েছেন তাঁদেরকে নেতার মর্যাদায় উন্নীত করা হয়েছে।

যায়েদ বিন্ হারিসা (রা) যৌবনে পদার্পণের পর রসূলুল্লাহ্ (সা) নিজ ফুফাতো বোন হযরত যয়নব বিন্তে জাহ্শ (রা)-কে তাঁর নিকট বিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব পাঠান। হযরত যায়েদ (রা) যেহেতু মুক্তিপ্রাপ্ত দাসের কালিমা বিজড়িত ছিলেন সুতরাং হযরত যয়নব ও তাঁর ভ্রাতা আবদুল্লাহ্ বিন্ জাহ্শ এ সম্বন্ধ স্থাপনে এই বলে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন যে, আমরা বংশমর্যাদায় তার চাইতে শ্রেষ্ঠ ও উন্নত।

এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ الاٰيَةَ নাযিল হয়।

যাতে এ হিদায়ত রয়েছে যে, যদি রসূলুল্লাহ্ (সা) কারো প্রতি বাধ্যতামূলকভাবে কোন কাজের নির্দেশ প্রদান করেন তবে সে কাজ করা তার উপর ওয়াজিব হয়ে যায়। শরীয়তানুযায়ী তার তা না করার অধিকার থাকে না। শরীয়তে এ কাজ মূলত ওয়াজিব ও জরুরী না হলেও যেহেতু তিনি এ কাজের নির্দেশ প্রদান করেছেন, সুতরাং তার উপর সে কাজ ওয়াজিব ও অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। যে ব্যক্তি তা করবে না আয়াতের পরিশেষে একে স্পষ্ট গোমরাহী বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

হযরত যয়নব ও তাঁর ভাই এ আয়াত শুনে তাদের অসম্মতি প্রত্যাহার করে নিয়ে বিয়েতে রাযী হয়ে যান। অতপর বিয়ে অনুষ্ঠিত হয়। যার মহর দশটি লাল দীনার (প্রায় চার তোলা স্বর্ণ) ও ষাট দিরহাম (প্রায় আঠারো তোলা রৌপ্য) এবং একটি বার বরদারীর জন্তু, এক পরস্ত লাওয়াযেমাত আনুমানিক পঁচিশ সের আটা ও পাঁচ সের খেজুর—রসূলুল্লাহ্ (সা) স্বয়ং নিজের পক্ষ থেকে আদায় করে দেন। (ইবনে কাসীর) অধিকাংশ তফসীরকারের নিকট হযরত যায়েদ ও হযরত যয়নবের বিয়ে সংশ্লিষ্ট ঘটনাই এ আয়াতের শানে-নুযূল।---(ইবনে কাসীর, কুরতুবী, মাযহারী)

ইবনে কাসীর প্রমুখ মুফাস্সির অনুরূপ আরো দু'টি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যেও একথার উল্লেখ রয়েছে যে, উপরে বর্ণিত আয়াত এসব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই

নাযিল হয়েছে। তন্মধ্যে একটি হযরত জুলায়বীব (রা)-এর ঘটনা। তা এই যে, তিনি এক আনসার সাহাবীর মেয়ের সাথে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করতে ইচ্ছুক ছিলেন। এই আনসার ও তাঁর পরিবার-পরিজন এ সম্বন্ধ স্থাপনে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলেন। কিন্তু এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর সবাই রাযী হয়ে যান এবং যথারীতি বিয়েও সম্পন্ন হয়ে যায়। নবীজী (সা) তাদের জন্য পর্যাপ্ত জীবিকা কামনা করে দোয়া করলেন। সাহাবায়ে কিরাম বলেন যে, তার গৃহে এত বরকত ও ধনসম্পদের এত আধিক্য ছিল যে, মদীনার গৃহসমূহের মধ্যে এ বাড়িটিই ছিল সর্বাধিক উন্নত ও প্রাচুর্যের অধিকারী এবং এর খরচের অংকও ছিল সবচাইতে বেশি। পরবর্তীকালে হযরত জুলায়বীব (রা) এক জিহাদে শাহাদাত বরণ করেন। রসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর দাফন-কাফন নিজ হাতে সম্পন্ন করেন।

অনুরূপভাবে উম্মে কুলসুম বিন্‌তে ওকবা বিন্ আবী মুয়ীত সম্পর্কেও হাদীসের রেওয়ায়েতসমূহে এক ঘটনার উল্লেখ রয়েছে। ---(ইবনে কাসীর, কুরতুবী)। প্রকৃত প্রস্তাবে এগুলোর মাঝে কোন বিরোধ বা অসামঞ্জস্য নেই। এরূপ একাধিক ঘটনাই আয়াত নাযিল হওয়ার কারণ হতে পারে।

বিয়ে-শাদীতে বংশগত সমতা রক্ষার নির্দেশ এবং তার স্তরঃ উল্লিখিত বিয়েতে হযরত যয়নব ও তাঁর ভ্রাতা আবদুল্লাহ্ (রা)-র প্রথম পর্যায়ে অসম্মতির কারণ ছিল, উভয় পক্ষে বংশগত সমতা ও সাদৃশ্যের অনুপস্থিতি এবং এ কারণ সম্পূর্ণ শরীয়ত-সম্মত। রসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেছেন যে, মেয়েদের বিয়ে-শাদী সমমর্যাদাসম্পন্ন বংশে দেওয়া উচিত---যার সঠিক ব্যাখ্যা পরে আসছে। এখন প্রশ্ন উঠে যে, এক্ষেত্রে হযরত যয়নব (রা) ও তাঁর ভাইয়ের আপত্তি কেন গৃহীত হলো না।

উত্তর এই যে, ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে দম্পতিদ্বয়ের উভয় পক্ষে সকল ক্ষেত্রে সমতা ও সাদৃশ্য একান্ত প্রয়োজনীয়। কোন কাফিরের সহিত কোন মুসলিম মেয়ের বিয়ে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। যদিও মেয়ের এতে সম্মতি থাকে। কেননা এটা কেবল মেয়ের অধিকার নয় যে, শুধু তার সম্মতির কারণেই তা রহিত হয়ে যাবে; বরং আল্লাহ্‌র হক ও অধিকার এবং আল্লাহ্ কর্তৃক আরোপিত ফরয ও অবশ্য পালনীয় নির্দেশ। পক্ষান্তরে বংশগত ও অর্থনৈতিক সমতার ব্যাপারটা এর থেকে সম্পূর্ণ পৃথক---কেননা এটা হলো মেয়ের অধিকার। আর বংশগত সমতার অধিকারের বেলায় মেয়ের সাথে সাথে তার অভিভাবকগণও শরীক আছে। যদি কোন বিবেকসম্পন্না পূর্ণ বয়স্কা মেয়ে ধনাঢ্য পরিবারভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও কোন দরিদ্র ছেলের সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হতে রাযী হয়ে নিজস্ব অধিকার পরিহার করে দেয়, তবে তার সে অধিকার রয়েছে। কোন বিশেষ কল্যাণ ও মঙ্গলের কথা বিবেচনা করে কোন মেয়ে ও অভিভাবকবৃন্দ যদি বংশগত সমতার দাবি পরিহার করে এমন এক ব্যক্তির সহিত বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনে রাযী হয়ে যায়, যারা বংশগতভাবে তাদের চাইতে হেয়, তবে তাদের এ অধিকার রয়েছে। বরং ধর্মীয় মঙ্গলামঙ্গলের কথা বিবেচনা করে এ অধিকার পরিহার করা বিশেষ

প্রশংসনীয় ও কাম্য। এ জন্যই রসূলুল্লাহ্ (সা) বহু ক্ষেত্রে ধর্মীয় মঙ্গলের কথা বিবেচনা করে এ অধিকার পরিহারপূর্বক বিয়ের কাজ সম্পন্ন করার পরামর্শ দিয়েছেন।

কোরআন করীমের ব্যাখ্যা ও মর্মানুযায়ী একথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত যে, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে উম্মতের প্রত্যেকের উপর রসূলুল্লাহ্ (সা)-র হক ও অধিকার সব-চাইতে বেশি। এমনকি স্বয়ং নিজের চাইতে বেশি। যেমন কোরআনে হাকীমে ইরশাদ হয়েছে ঃ اَلنَّبِىُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ অর্থাৎ---মু'মিনগণের উপর নবীর হক স্বয়ং তাদের নিজেদের চাইতেও বেশি। তাই হযরত যয়নব ও আবদুল্লাহ্র ব্যাপারে যখন রসূলুল্লাহ্ (সা) বংশগত সমতার অধিকার পরিহার করে হযরত যায়েদ বিন হারিসার সাথে বিয়েতে সম্মতি দানের নির্দেশ দেন, তখন এই হুকুমের সামনে নিজেদের মতামত ও অধিকার পরিত্যাগ করা তাদের উপর ফরয ও অপরিহার্য কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু এতে তাঁরা অসম্মতি প্রকাশ করায় কোরআনে করীমে এ আয়াত নাযিল হয়।

এখন প্রশ্ন উঠে যে, যখন স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ (সা)-ও বংশগত সমতা বজায় রাখা প্রয়োজনীয় বলে মনে করতেন, তবে তা রাখলেন না কেন? এর উত্তর উল্লিখিত বর্ণনার মাঝেই প্রকাশ পেয়ে গেছে যে, অন্য কোন ধর্মীয় মঙ্গলের দিক বিবেচনা করে এই বংশগত সমতা পরিহারযোগ্য। রসূলুল্লাহ্ (সা) জীবদ্দশায়ও এরূপ ধর্মীয় মঙ্গলের কথা বিবেচনা করে বংশগত সমতার অবর্তমানেও বহু বিয়ে অনুষ্ঠিত হয়। এর ফলে মূল মাস'আলার উপর কোন প্রভাব পড়ে না।

সমতার মাস'আলা ঃ বিয়ে-শাদী এমন এক ব্যাপার যে, এতে দম্পতির উভয়ের মাঝে স্বভাবগত সাদৃশ্য না থাকলে বিয়ের মূল উদ্দেশ্যই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়ে যায়, পরস্পরের হক ও অধিকার আদায়ের ব্যাপারে ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয়—পরস্পর কলহ-বিবাদ সৃষ্টি করে। তাই শরীয়তে সমতা ও পারস্পরিক সাদৃশ্য বিধানের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কিন্তু তার অর্থ এটা নয় যে, কোন উঁচু পরিবারের ব্যক্তি অপেক্ষাকৃত নীচু পরিবারের লোককে অপকৃষ্ট বলে মনে করবে। ইসলামে মানমর্যাদার মূলভিত্তি তাকওয়া, নিষ্ঠা ও ধর্মপরায়ণতা, এক্ষেত্রে বংশগত কৌলীন্য যতই থাকনা কেন আল্লাহ্র নিকটে এর সবিশেষ গুরুত্ব নেই। নিছক সামাজিক রীতিনীতি ও শৃংখলা বজায় রাখার জন্য বিয়ে-শাদীতে সমতা রক্ষার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেছেন যে, মেয়েদের বিয়ে তাদের অভিভাবকগণের মাধ্যমেই অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত অর্থাৎ প্রাপ্তবয়স্কা মেয়েদের পক্ষেও নিজের বিয়ের ব্যাপারে নিজে উদ্যোগী হয়ে চুকানো সংগত নয়---লজ্জা ও সম্ভ্রমের দিক বিবেচনায় এ দায়িত্ব পিতামাতা ও অন্যান্য অভিভাবকবৃন্দের উপরই ন্যস্ত থাকা উচিত। তিনি আরো ইরশাদ করেছেন যে, মেয়েদের বিয়ে সমকক্ষ পরিবারেই দেওয়া উচিত। হাদীসের সনদ যদিও দুর্বল; কিন্তু সাহাবায়ে কিরামের বিভিন্ন উক্তি ও

বাণীসমূহ দ্বারা সমর্থিত হওয়ায় এ হাদীস দলীল হিসেবে পেশ করার যোগ্যতা অর্জন করেছে। ইমাম মুহাম্মদ (র) 'কিতাবুল আসার' নামক গ্রন্থে হযরত ফারুকে আযম (রা)-এর উক্তি বর্ণনা করেছেন যে, আমি এ মর্মে ফরমান জারি করে দেব--যেন কোন সম্ভ্রান্ত খ্যাতনামা বংশের মেয়েকে অপেক্ষাকৃত অখ্যাত স্বল্প মর্যাদাসম্পন্ন পরিবারে বিয়ে দেয়া না হয়---অনুরূপভাবে হযরত আয়েশাও হযরত আনাস (রা)-এর প্রতি বিশেষ তাকীদ দিয়েছেন যেন সমতা রক্ষার প্রতি যথাযথ গুরুত্ব প্রদান করা হয়, যা বিভিন্ন সনদে বর্ণিত আছে। ইমাম ইবনে হুমাম (র)-ও ফতহুল কাদীরে একথা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন।

সারকথা এই যে, বিয়ে-শাদীতে উভয় পক্ষের সমতা ও সাদৃশ্যের প্রতি যথাযথ গুরুত্ব আরোপ শরীয়তে বিশেষভাবে কাম্য---যাতে উভয়ের মধ্যে সম্প্রীতি ও মনের মিল স্থাপিত হয়। কিন্তু কুফ্'র (সার্বিক সমতা বিধান) চাইতে অধিক গুরুত্বপূর্ণ কল্যাণ ও মঙ্গলের দিক যদি সামনে আসে তবে কনে ও তার অভিভাবকবৃন্দের পক্ষে তাদের এ অধিকার পরিত্যাগ করে বিয়ের অনুষ্ঠান সম্পন্ন করে নেওয়া জায়েয আছে। বিশেষ করে কোন ধর্মীয় কল্যাণ ও মঙ্গল সাধনের উদ্দেশ্যে এরূপ করা উত্তম ও অধিক কাম্য। যেমন সাহাবায়ে কিরামের বিভিন্ন ঘটনা থেকে এ কথার প্রমাণ মিলে। এ দ্বারা এ কথাও বোঝা যায় যে, এসব ঘটনা কুফ্'র (সমতা বিধান) মূল মাস'আলার পরিপন্থী নয়।

দ্বিতীয় ঘটনা ঃ নবীজী (সা)-র নির্দেশ মুতাবিক হযরত যায়েদ বিন হারিসার সাথে হযরত যয়নবের বিয়ে সম্পন্ন হয়ে যায়। কিন্তু তাদের স্বভাব-প্রকৃতিতে মিল হয়নি। হযরত যায়েদ (রা) হযরত যয়নব (রা) সম্পর্কে ভাষাগত শ্রেষ্ঠত্ব, গোত্রগত কৌলীন্যাভিমান এবং আনুগত্য ও শৈথিল্য প্রদর্শনের অভিযোগ উত্থাপন করতেন। অপর দিকে নবীজী (সা)-কে ওহীর মাধ্যমে একথা জ্ঞাত করানো হয় যে, হযরত যায়েদ (রা) হযরত যয়নবকে তালাক দিয়ে দেবেন; অতপর হযরত যয়নব (রা) হুযূরে পাক (সা)-র পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হবেন। একদিন হযরত যায়েদ (রা) রসূলুল্লাহ্ (সা)-র খিদমতে এসব অনুযোগ পেশ করতে গিয়ে হযরত যয়নবকে তালাক দেওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করেন। নবীজী (সা) যদিও আল্লাহ্ পাক কর্তৃক অবহিত হয়েছিলেন যে, ঘটনার পরিণতি এ পর্যায়ে গিয়ে গড়াবে যে, হযরত যায়েদ (রা) হযরত যয়নব (রা)-কে তালাক দিয়ে দেবেন, অতপর হযরত যয়নব (রা) নবীজীর সহিত পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হবেন। কিন্তু দু'কারণে তিনি হযরত যায়েদকে তালাক দিতে বারণ করলেন। প্রথমত, তালাক দেওয়া যদিও শরীয়তে জায়েয, কিন্তু পছন্দনীয় ও কাম্য নয় বরং বৈধ বস্তুসমূহের মাঝে নিকৃষ্টতম ও সর্বাধিক অবাঞ্ছনীয়। আর পার্থিব দিক থেকে কোন কার্য সংঘটিত হওয়া শরীয়তের হুকুমকে প্রভাবান্বিত করে না। দ্বিতীয়ত, নবীজী (সা)-র অন্তরে এরূপ ধারণা সৃষ্টি হয় যে, যদি হযরত যায়েদ তালাক দেওয়ার পর তিনি হযরত যয়নবের পাণি গ্রহণ করেন তবে আরববাসী বর্বর

যুগের প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী এই অপবাদ দেবে যে, তিনি নিজ পুত্রবধূকে বিয়ে করেছেন। যদিও কোরআনে পাক সূরায়ে আহযাবের পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে বর্বর যুগের এ কুপ্রথাকে ভ্রান্ত ও অযৌক্তিক বলে খন্ডন করে দিয়েছে। এরপর কোন মু'মিনের মনে এরূপ ধারণা সৃষ্টির আশংকা ছিল না; কিন্তু যে কাফিরদের কোরআনের প্রতি কোন আস্থাই নেই, তারা বর্বর যুগের প্রথানুযায়ী পালক পুত্রকে সকল ব্যাপারে প্রকৃত পুত্রতুল্য মনে করে অপবাদের ঝড় তুলবে।---এ আশংকাও তালাক প্রদান থেকে হযরত যায়েদকে বারণ করার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এ পরিপ্রেক্ষিতে হক তা'আলার পক্ষ থেকে বন্ধুসুলভ দরদমাখা শাসনবাক্য কোরআনে পাকের এ আয়াতসমূহে নাযিল হয়ঃ

إِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ

أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ

وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ

অর্থাৎ (সেই সময়ের কথা স্মরণ করুন) যখন আপনি, আল্লাহ্ পাক ও আপনি যার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, তাকে বলছিলেন যে, তুমি নিজ স্ত্রীকে তোমার বিবাহাধীনে থাকতে দাও। এ ব্যক্তি হযরত যায়েদ। আল্লাহ্ পাক তাঁকে ইসলামে দীক্ষিত করে তার প্রতি প্রথম অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন। দ্বিতীয়ত, নবীজীর সাহচর্য লাভের গৌরব প্রদান করেন এবং নবীজী তাঁর প্রতি প্রথম অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন---তাঁকে গোলামি থেকে অব্যাহতি দানের মাধ্যমে। দ্বিতীয়ত, নবীজী (সা) তাঁকে এমন শিক্ষাদীক্ষার মাধ্যমে গড়ে তোলেন যে, তাঁর প্রতি বিশিষ্ট সাহাবায়ে কিরাম পর্যন্ত সম্মান প্রদর্শন করতেন। পরবর্তী পর্যায়ে হযরত যায়েদের প্রতি নবীজী (সা)-র প্রয়োগকৃত উক্তি নকল করা হয়েছেঃ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ অর্থাৎ নিজ স্ত্রীকে তোমার বিবাহাধীনে থাকতে দাও এবং আল্লাহ্কে ভয় কর। এক্ষেত্রে আল্লাহ্কে ভয় করার নির্দেশ এ মর্মেও হতে পারে যে, তালাক একটি অপকৃষ্ট ও গর্হিত কাজ, সুতরাং এ থেকে বিরত থাক। আবার এ অর্থেও ব্যবহৃত হতে পারে যে, বিবাহাধীনে বহাল রাখার পর স্বভাবগত গরমিল ও অবজ্ঞার দরুন তাঁর অধিকারসমূহ আদায়ের বেলায় যেন কোন প্রকারের শৈথিল্য প্রদর্শন না করে। তাঁর (সা) এ উক্তি এ জায়গায় সম্পূর্ণ ঠিক ও যথার্থই ছিল। কিন্তু আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সংঘটিতব্য ঘটনা সম্পর্কে অবহিত হওয়ার এবং অন্তরে হযরত যয়নবের পাণি গ্রহণের বাসনা উদ্রেকের পর হযরত যায়েদের প্রতি তালাক না দেওয়ার উপদেশ এক প্রকারের বাহ্যিক ও আনুষ্ঠানিক হিতাকাঙ্ক্ষার বহিঃপ্রকাশেরই পর্যায়ভুক্ত ছিল, যা রসূলের পদমর্যাদার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না। বিশেষ করে এ কারণে যখন এর সাথে জনমণ্ডলীর

অপবাদের আশংকাও বিদ্যমান ছিল। তাই উল্লিখিত আয়াতে শাসন বাক্যের ভাষা ছিল এরূপ যে, আপনি যে কথা মনে মনে লুকিয়ে রাখছিলেন তা আল্লাহ্ পাক প্রকাশ করে দেবেন। যখন আল্লাহ্র পক্ষ থেকে হযরত যয়নবের সহিত আপনার পরিণয় সম্পর্ক স্থাপনের সংবাদ সম্পর্কে আপনি অবহিত রয়েছেন এবং আপনার অন্তরেও বিয়ের বাসনার উদ্রেক করেছে তখন এ ইচ্ছা ও বাসনা গোপন রেখে এমন প্রকারের বাহ্যিক ও আনুষ্ঠানিক আলোচনা করেছেন যা আপনার মর্যাদার পরিপন্থী। জনমণ্ডলীর অপবাদের ভয় সম্পর্কে ফরমান যে, আপনি মানুষকে ভয় করছেন, অথচ ভয় তো করা উচিত কেবল আল্লাহ্কে। অর্থাৎ যখন আপনি জ্ঞাত ছিলেন যে, এ ব্যাপার আল্লাহ্র পক্ষ থেকেই সংঘটিত হবে---এতে যখন তাঁর অসন্তুষ্টির কোন আশংকাই নেই তখন নিছক মানুষের ভয়ে এ ধরনের উক্তি যুক্তিযুক্ত হয়নি।

এ ঘটনা সংশ্লিষ্ট উপরে বর্ণিত বিবরণ 'তফসীরে ইবনে কাসীর' 'কুরতুবী' ও 'রূহুল মা'আনী' থেকে সংগৃহীত হয়েছে এবং আয়াত تُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللّٰهُ مُبْدِيهِ -এর ব্যাখ্যা এই যে, আপনি অন্তরে যে বিষয় গোপন রেখেছেন তা এ বাসনা যে, হযরত যায়েদ (রা) হযরত যয়নবকে তালাক দিলে পর আপনি তাঁর পাণি গ্রহণ করবেন। এ ব্যাখ্যা হাকেম, তিরমিযী, ইবনে আবী হাতেম প্রমুখ মুহাদ্দিসীনে কিরাম হযরত আলী বিন হুসায়ন যয়নুল আবেদীনের রেওয়ায়েত থেকে নকল করেছেন। রেওয়ায়েতের নকল নিম্নে প্রদত্ত হলো ঃ

اوحى الله تعالى اليه صلى الله عليه وسلم ان زينب سيطلقها زيد ويتزوجها بعده عليه الصلوة والسلام--অর্থাৎ মহান আল্লাহ্ স্বীয় নবী (সা)-কে একথা ওহীর মাধ্যমে জ্ঞাত করেছেন যে, হযরত যায়েদ অনতিবিলম্বে হযরত যয়নবকে তালাক দেবেন, অতপর যয়নব নবীজী (সা)-র সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হবেন। (রূহুল মা'আনী---হাকেমে তিরমিযী থেকে উদ্ধৃত)।

ইবনে কাসীর ইবনে আবী হাতেমের উদ্ধৃতি দিয়ে নিম্নোক্ত শব্দ সমষ্টি নকল করেছেন ঃ

ان الله اعلم نبيه انها ستكون من ازواجه قبل ان يتزوجها فلما اتاه زيد ليشكوها اليه قال اتق الله امسك عليك زوجك فقال اخبرتك اني مزوجكها وتخفي في نفسك ما الله مبديه

অর্থাৎ আল্লাহ্ পাক তাঁর নবী (সা)-কে এ মর্মে অবহিত করেছেন যে, হযরত যয়নবও অনতিবিলম্বে পুণ্যবতী স্ত্রীগণের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবেন। অতপর যখন

হযরত যায়েদ তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে নবীজী (সা)-র খিদমতে উপস্থিত হন, তখন তিনি (সা) বলেন যে, আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং স্বীয় স্ত্রীকে তালাক দিও না। অতপর আল্লাহ্ পাক বলেন যে, আমি তো আপনাকে এ কথা বলে দিয়েছিলাম যে, আমি তাঁকে আপনার (সা) সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করে দেব এবং আপনি এমন একটি বিষয় গোপন করে রেখে আসছিলেন, যা আল্লাহ্ প্রকাশ করে দেবেন।

অধিকাংশ তফসীরকার যথা যুহ্‌রী, বকর ইবনুল আলা, কুশাইরী ও কাযী আবূ বকর ইবনুল আরাবী প্রমুখ এ তফসীরই গ্রহণ করেছেন, যে বিষয় অন্তরে গোপন রয়েছে বলে বর্ণনা করা হয়েছে ওহীয়ে ইলাহী অনুযায়ী রেওয়ায়েতে ما في نفسك -এর তফসীর হযরত যয়নব (রা)-র প্রতি ভালবাসা বলে বর্ণনা করা হয়েছে। সে সম্পর্কে প্রখ্যাত মুফাস্‌সির ইবনে কাসীর মন্তব্য করেন যে, এসব রেওয়ায়েতের মধ্যে কোনটাই বিশুদ্ধ ও প্রামাণ্য নয় বলে আমরা এগুলোর উল্লেখ বাঞ্ছনীয় মনে করিনি।

বস্তুত কোরআন পাকের শব্দাবলীতেও হযরত যয়নুল আবেদীন (রা)-এর রেওয়ায়েতে উপরে বর্ণিত এ তফসীরেরই সমর্থন মেলে। কেননা এ আয়াতে স্বয়ং আল্লাহ্ পাক বলে দিচ্ছেন যে, অন্তরে লুকায়িত বস্তু তাই ছিল যা আল্লাহ্ পাক প্রকাশ করে দেবেন। আল্লাহ্ পাক পরবর্তী আয়াতে যে বিষয় প্রকাশ করেছেন তা হলো হযরত যয়নবের সাথে হুযূর (সা)-এর বিয়ে। যেমন--বলেছেন زوجنكها অর্থাৎ আমি আপনাকে তাঁর (হযরত যয়নব) সাথে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করে দিলাম।--(রূহুল মা'আনী)।

অপবাদ থেকে বেঁচে থাকা বাঞ্ছনীয়ঃ প্রশ্ন উঠে যে, মানুষের অপবাদ ও ভর্ৎসনা থেকে বাঁচার জন্য রসূলুল্লাহ্ (সা) এমন বিষয়কে গোপন করলেন কেন, যা আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টির কারণ হয়ে দাঁড়াল। এর উত্তর এই যে, এ ক্ষেত্রে কোরআন-হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আসল বিধান হল, যে কাজ করলে মানুষের মাঝে ভুল বোঝাবুঝি এবং তাদের ভর্ৎসনা ও অপবাদ দেওয়ার পাপে লিপ্ত হওয়ার আশংকা থাকে, সেগুলোকে পরিহার করা সেক্ষেত্রে তো অবশ্যই জায়েয যখন এ কাজ শরীয়তের মূল লক্ষ্য-বস্তুসমূহের অন্তর্ভুক্ত না হয় এবং হালাল-হারাম জনিত কোন দীনী নির্দেশ এর সাথে জড়িত না থাকে, যদিও কাজটি মূলত প্রশংসনীয়ই হয়। যার উদাহরণ নবীজী (সা)-র হাদীসে বিদ্যমান রয়েছে। যথা নবীজী (সা) ইরশাদ করেছেন যে, অজ্ঞতা ও বর্বরতার যুগে যখন কা'বাঘর নির্মিত হয়, তখন এতে কয়েকটি কাজ হযরত ইব্রাহীম (আ) অনুসৃত রূপরেখার উল্টো করা হয়। ১. কা'বা গৃহের অংশ-বিশেষ নির্মাণ বহির্ভূত করে রাখা হয়। ২. হযরত ইব্রাহীম (আ) কর্তৃক নির্মাণ-কালে বায়তুল্লাহ্‌র অভ্যন্তরে প্রবেশের জন্য দুটি দরজা ছিল, একটি পশ্চিম দিকে অপরটি পূর্বদিকে। ফলে বায়তুল্লাহ্‌র ভেতরে যাতায়াতে কোন প্রকারের অসুবিধা হতো না। জাহিলিয়াত যুগের লোকেরা এতে দু'ভাবে হস্তক্ষেপ করল। পশ্চিম দিকের দরজা একেবারে বন্ধ করে দেওয়া হল এবং পূর্ব দিকের দরজা যা--ভূতলের প্রায় সম উচ্চতা

বিশিষ্ট ছিল, তা এতটুকু উঁচু করা হল যে, সিঁড়ি ব্যতীত সে দরজা দিয়ে প্রবেশ করা যেত না। উদ্দেশ্য এই ছিল যে, যাকে তাঁরা অনুমতি দেবে কেবল সে-ই এর ভিতর প্রবেশ করতে পারবে।

রসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন যে, যদি নও-মুসলিমগণের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টির আশংকা না থাকত তবে আমি কা'বাঘর হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর রূপরেখা অনুযায়ী পুনর্নির্মাণের ব্যবস্থা করতাম, এ হাদীস প্রত্যেক প্রামাণ্য গ্রন্থেই রয়েছে। এর দ্বারা বোঝা গেল যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) মানুষকে ভুল বোঝাবুঝি থেকে বাঁচানোর উদ্দেশ্যে তাঁর এ বাসনা শরীয়ত মতে প্রশংসনীয় হওয়া সত্ত্বেও পরিত্যাগ করেছেন। অবশ্য এ পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অসন্তুষ্টি জ্ঞাপন কোন ওহীও আসেনি। সুতরাং এ কাজ আল্লাহ্ পাকের নিকট গৃহীত হয়েছে বলেই বোঝা যায়। কিন্তু হযরত ইবরাহীম (আ)-এর রূপরেখা অনুযায়ী বায়তুল্লাহ্র পুনর্নির্মাণ এমন কোন ব্যাপার নয়, যার উপর শরীয়তের কোন উদ্দেশ্য নির্ভরশীল অথবা যার সাথে হালাল-হারাম সংশ্লিষ্ট হুকুমসমূহ জড়িত।

পক্ষান্তরে হযরত যয়নব (রা)-এর বিয়ের ঘটনার সাথে তথাকথিত পালক পুত্রের তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর সঙ্গে বিয়ে হারাম হওয়া সংক্রান্ত বর্বর যুগের প্রচলিত কুপ্রথা ও ভ্রান্ত ধারণা কার্যকরভাবে অপনোদনের এক বিশেষ শরীয়তী উদ্দেশ্য জড়িত ছিল। কেননা সমাজ প্রচলিত কুপ্রথার কার্যকরভাবে মূল উৎপাটন তখনই সম্ভব, যখন হাতেকলমে বাস্তবে করে দেখান হয়। হযরত যয়নবের বিয়ে সংশ্লিষ্ট আল্লাহ্ পাকের নির্দেশ এ উদ্দেশ্যের পূর্ণতা সাধনের জন্যই ছিল। এ বক্তব্যের মাধ্যমে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর নক্শা অনুযায়ী বায়তুল্লাহ্ পুনর্নির্মাণের পরিকল্পনা কার্যকর না করা এবং আল্লাহ্ পাকের ইরশাদ মুতাবিক যয়নব (রা)-এর বিয়ে কার্যকরী করার মধ্যকার বাহ্যত প্রতীয়মান বিরোধ ও বৈপরীত্যের উত্তর হয়ে গেল।

এ প্রসঙ্গে বোঝা যায়, যেন রসূলুল্লাহ্ (সা) সূরায়ে আহযাবের প্রথম আয়াত-সমূহে বর্ণিত এই হুকুমের মৌখিক প্রচারই যথেষ্ট বলে মনে করতেন। এর কার্যকর ও বাস্তব প্রয়োগের তাৎপর্য ও প্রয়োজনীয়তার প্রতি লক্ষ্য করেন নি। তাই জানা ও ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তা গোপন রেখেছিলেন। উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ্ পাক এটি সংশোধন করে তা প্রকাশ করেছেন ঃ— لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا অর্থাৎ আমি আপনার সাথে যয়নবের বিয়ে সম্পন্ন করেছি যাতে মুসলমানগণ নিজেদের পালক পুত্রের তালাক-প্রাপ্তা স্ত্রীকে বিয়ে করতে গিয়ে কোন জটিলতার সম্মুখীন না হয়।

زوجنكها—এর শাব্দিক অর্থ আপনার সাথে তাঁর বিয়ে স্বয়ং আমি সম্পন্ন করে দিয়েছি। এর ফলে এ কথা বোঝা যায় যে, এ বিয়ে স্বয়ং আল্লাহ্ পাক সম্পন্ন করে দেওয়ার মাধ্যমে বিয়ে-শাদীর সাধারণভাবে প্রচলিত শর্তাবলীর ব্যতিক্রম ঘটিয়ে এ বিয়ের প্রতি বিশেষ মর্যাদা আরোপ করেছেন। আবার এর অর্থ এরূপও হতে পারে যে, এ বিয়ের নির্দেশ আমি প্রদান করলাম, এখন আপনি শরীয়তী বিধিবিধান ও শর্তাবলী মুতাবিক তা সম্পন্ন করে নিন। মুফাস্সিরগণের মধ্যে কিছু সংখ্যক প্রথম অর্থ এবং কিছু সংখ্যক দ্বিতীয় অর্থ অধিক যুক্তিযুক্ত বলে মন্তব্য করেছেন।

অন্যান্য স্ত্রীলোকের সম্মুখে হযরত যয়নবের এরূপ উক্তি যে, তোমাদের বিয়ে তো তোমাদের পিতামাতা কর্তৃক সম্পন্ন হয়; কিন্তু আমার বিয়ে স্বয়ং আল্লাহ্ পাক আকাশে সম্পন্ন করেছেন---যা বিভিন্ন রেওয়ায়েতে পরিলক্ষিত হয়। একথা উপরোক্ত উভয় অর্থের বেলায়ই প্রযোজ্য। যা প্রথম অর্থে অধিক স্পষ্ট; অবশ্য দ্বিতীয় অর্থও এর পরিপন্থী নয়।

বিভিন্ন সন্দেহ ও প্রশ্নাবলীর উত্তরের সূচনাঃ سُنَّةَ اللّٰهِ فِى الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ قَدَرًا مَّقْدُوْرًا এ আয়াতের মাধ্যমে এ বিয়ের পরিপ্রেক্ষিতে উদ্ভূত সন্দেহসমূহের উত্তরের সূচনা এরূপভাবে করা হয়েছে যে, অন্যান্য পুণ্যবতী স্ত্রীগণ থাকা সত্ত্বেও এ বিয়ের পেছনে কি উদ্দেশ্য নিহিত ছিল?---ইরশাদ হয়েছে যে, এটা আল্লাহ্ পাকের চিরন্তন বিধান যা কেবল মুহাম্মদ (সা)-এর জন্যই নির্দিষ্ট নয়; আপনার পূর্ববর্তী নবীগণের কালেই ধর্মীয় স্বার্থ ও মঙ্গলামঙ্গলের কথা বিবেচনা করে বহু সংখ্যক স্ত্রীলোকের পাণি গ্রহণের অনুমতি ছিল। তন্মধ্যে হযরত দাউদ ও হযরত সুলায়মান (আ)-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। হযরত দাউদ ও হযরত সুলায়মান (আ)-এর যথাক্রমে একশত ও তিনশত স্ত্রী ছিল। সুতরাং রসূলুল্লাহ্ (সা)-র বেলায়ও বিভিন্ন ধর্মীয় স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রেখে এ বিয়ে সহ একাধিক বিয়ের অনুমতি লাভ বিচিত্র কিছু নয়। এটা নবুয়ত ও রিসালতের মহান মর্যাদা ও তাক্ওয়া পরহিযগারীর পরিপন্থীও নয়। সর্বশেষ বাক্যে এ কথাও বলে দেওয়া হয়েছে যে, বিয়ে-শাদী অর্থাৎ কার সাথে কার বিয়ে অনুষ্ঠিত হবে তা মানুষের জীবিকার ন্যায় আল্লাহ্ পাক কর্তৃক সম্পূর্ণভাবে পূর্ব-নির্ধারিত ব্যাপার। এ সম্পর্কে ভাগ্যলিপিতে যা আছে তাই বাস্তবায়িত হবে। এ ক্ষেত্রেও হযরত যায়েদ ও হযরত যয়নবের স্বভাব-প্রকৃতির বিভিন্নতা, হযরত যায়েদের অসন্তুষ্টি--পরিশেষে তালাক প্রদানের সংকল্প, এ সব কিছুই ভাগ্যলিপির পর্যায়ক্রমিক বহিঃপ্রকাশ মাত্র।

পরবর্তী পর্যায়ে অতীতকালে যেসব নবী (আ)-র বহু সংখ্যক স্ত্রী গ্রহণের অনুমতি ছিল বলে উপরে জানা গেছে, তাঁদের বৈশিষ্ট্য ও বিশেষ গুণাবলীর বর্ণনা

দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ অর্থাৎ এসব মহীয়ান নবীগণ (আ) সবাই আল্লাহ্ পাকের বাণীসমূহ নিজ নিজ উম্মতের নিকটে পৌঁছিয়েছেন।

একটি জ্ঞানগর্ভ নিগূঢ় তত্ত্ব ঃ সম্ভবত এতে নবীগণ (আ)-এর বহু সংখ্যক স্ত্রী থাকার তাৎপর্য ও যৌক্তিকতার প্রতি ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে যে, এঁদের (আ) যাবতীয় কাজকর্ম ও বাণীসমূহ উম্মত পর্যন্ত পৌঁছা একান্ত আবশ্যক। পুরুষদের জীবনের এক বিরাট অংশ ঘরোয়া পরিবেশে স্ত্রী ও পুত্র-পরিজনের সাথে কাটাতে হয়। এ সময় যে সব ওহী নাযিল হয়েছে বা স্বয়ং নবীজী যেসব নির্দেশ প্রদান করেছেন অথবা কোন কাজ করেছেন—এগুলো সবই উম্মতের আমানত স্বরূপ, যেগুলো কেবল পুণ্যবতী স্ত্রীগণের মাধ্যমেই সহজতরভাবে উম্মতের নিকট পৌঁছানো সম্ভব ছিল। পৌঁছানোর অন্যান্য পদ্ধতি জটিলতামুক্ত নয়। তাই নবীগণ (আ)-এর অধিক সংখ্যক স্ত্রী থাকলে তাঁদের পারিবারিক জীবনের কার্যক্রম ও কথাবার্তা এবং তাদের ঘরোয়া পরিবেশের চরিত্র ও রূপরেখা সাধারণ উম্মত পর্যন্ত পৌঁছা সহজতর হবে।

নবীগণ (আ)-এর যে অপর এক গুণ বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে তা এই— وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ অর্থাৎ এসব মহাত্মা আল্লাহ্ পাককে ভয় করেন এবং আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাউকে ভয় করেন না। ধর্মীয় কল্যাণ ও মঙ্গলার্থে কোন কাজ বা বিষয় প্রকাশ্য ও সরাসরি তাবলীগের জন্য যদি তাঁরা আদিষ্ট হন তবে এতে তাঁরা কোন প্রকারের শৈথিল্য প্রদর্শন করেন না। এরূপ করতে গিয়ে তাঁরা কোন মহলের কটাক্ষপাত ও বিরূপ সমালোচনারও কোন পরোয়া করেন না।

একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর ঃ এখানে যখন সমগ্র নবীরই এরূপ অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে যে, তাঁরা আল্লাহ্ পাক ভিন্ন আর কাউকে ভয় করেন না। অথচ এর পূর্ববর্তী আয়াতে রসূলুল্লাহ্ (সা) সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে ঃ تَخْشَى النَّاسَ (অর্থাৎ আপনি মানুষকে ভয় করেন)—এটা কিভাবে সম্ভব? উত্তর এই যে, উল্লিখিত আয়াতে নবীগণ (আ)-এর আল্লাহ্ পাক ভিন্ন অন্য কাউকে ভয় না করা—এটা কেবল রিসালত সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি এবং তবলীগের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সা)-র মাঝে এমন এক বিষয় সম্পর্কে কটাক্ষপাতের ভয় উদ্রেক করেছে, যা ছিল বাহ্যত একটি পার্থিব কাজ। তবলীগ ও রিসালতের সাথে এর কোন সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু উল্লিখিত আয়াত-সমূহের মাধ্যমে যখন আপনার নিকট একথা পরিষ্কার হয়ে গেল যে, এ বিয়ে বাস্তব ও কার্যকর তবলীগ এবং রিসালতের অংশ বিশেষ, তখন কারো কটাক্ষপাত ও নিন্দাবাদের ভয় তাঁর কর্তব্য পথেও কোন বাধা বা প্রতিবন্ধকতা আরোপ করতে পারেনি। তাই অবিশ্বাসী কাফিরদের পক্ষ থেকে নানাবিধ আপত্তি ও প্রশ্ন উত্থাপিত হওয়া সত্ত্বেও এ বিয়েকে

বাস্তব রূপ প্রদান করা হয়েছিল। বস্তুত অদ্যাবধিও এ সম্পর্কে বিভিন্ন অবান্তর প্রশ্নের অবতারণা হতে দেখা যায়।

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٤٠﴾

(৪০) মুহাম্মদ তোমাদের কোন ব্যক্তির পিতা নন ; বরং তিনি আল্লাহ্‌র রসূল এবং শেষ নবী। আল্লাহ্ সব বিষয়ে জ্ঞাত।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

[প্রথম আয়াতসমূহে হযরত যয়নব (রা)-এর বিয়ে একটি শরীয়তী বিধান ও তত্ত্বের বাস্তব তবলীগ এবং নবীগণের সুন্নত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে কাম্য ও প্রশংসনীয় বলে বর্ণনা করা হয়েছিল। পরবর্তী পর্যায়ে সেসব প্রশ্নকারীদের উত্তর দেওয়া হয়েছে, যারা এ বিয়ে গর্হিত মনে করে কটাক্ষপাত করছিল অর্থাৎ] মুহাম্মদ (সা) তোমাদের পুরুষগণের মধ্য থেকে কারো পিতা নন [অর্থাৎ যেসব লোকের রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সাথে সন্তানগত সম্পর্ক নেই। যেমন এ আয়াতে সাধারণ সাহাবাবৃন্দকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে رِجَالِكُمْ অর্থাৎ তোমাদের পুরুষদের মধ্য থেকে কারো পিতা নন। এখানে নবীজী ব্যতীত অপরাপর লোকদেরকে এর আওতাভুক্ত করা হয়েছে। নবীজী এর আওতাভুক্ত নন। সুতরাং নিজ পরিবারের কোন ব্যক্তির পিতা হওয়া এর পরিপন্থী নয়। যার মর্মার্থ এই যে, সাধারণ উম্মতভুক্ত কারো সাথে তাঁর পিতৃত্বের সম্পর্ক বিদ্যমান নেই, যা কোন নির্ভুল প্রমাণাদির দ্বারা তাদের তালাক-প্রদত্ত স্ত্রীর সাথে বিয়ে হারাম হওয়ার কারণ বলে বিবেচিত হতে পারে] কিন্তু (অপর এক প্রকারের আত্মিক পিতৃত্ব অবশ্যই বিদ্যমান রয়েছে। বস্তুত) তিনি আল্লাহ্‌র রসূল (এবং প্রত্যেক রসূল আত্মিক অভিভাবক হিসেবে সমগ্র উম্মতের আধ্যাত্মিক পিতা) এবং (এই আধ্যাত্মিক পিতৃত্বের ক্ষেত্রে তিনি এমন চরম উৎকর্ষ সাধন করেছেন যে, তিনি সমস্ত রসূলের মধ্যে সর্বোত্তম ও পূর্ণতম। বস্তুত তিনি) সকল নবীর মোহর বিশেষ (এবং যে নবী এমন হবেন তিনি আধ্যাত্মিক পিতৃত্বের ক্ষেত্রে সর্বাধিক অগ্রগণ্য। কেননা তাঁর এ আধ্যাত্মিক পিতৃত্ব ধারা কিয়ামত পর্যন্ত বহাল থাকবে। ফলে তাঁর আধ্যাত্মিক সন্তান সর্বাধিক হবে। মোটকথা উম্মতের জন্য তাঁর পিতৃত্ব শারীরিক বা বংশগত নয়---বিয়ে হারাম হওয়া যার সাথে সম্পর্কিত ; বরং এ পিতৃত্বের সম্পর্কটা একান্তই আধ্যাত্মিক। তাই পালক পুত্রের পরিত্যক্ত স্ত্রীর সাথে বিয়ে অনুষ্ঠিত হওয়া কোন আপত্তিজনক ব্যাপার নয়। বরং সমগ্র মানব তাঁর প্রতি পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস স্থাপন করুক---আধ্যাত্মিক পিতৃত্ব এ কথাই কামনা করে) এবং (যদি এরূপ ওয়াস-ওয়াসার উদ্রেক করে যে, এ বিয়ে তো নাজায়েয

ছিল না, তবে সংঘটিত না হওয়াই উত্তম ছিল। এমতাবস্থায় কোন প্রশ্ন তোলার বা কটাক্ষ করার সুযোগই মিলত না। তবে একথা বুঝে নেওয়া উচিত যে) মহান আল্লাহ্ প্রত্যেক বস্তুর (অস্তিত্ব লাভ করা ও না করার উপকার ও উপযোগিতা সম্পর্কে) ভাল-ভাবেই জ্ঞাত।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

উল্লিখিত আয়াতে সেসব লোকের ধারণা অপনোদন করা হয়েছে, যারা বর্বর যুগের প্রথা অনুযায়ী হযরত যায়েদ বিন হারিসা (রা)-কে নবীজীর সন্তান বলে মনে করতো এবং তিনি হযরত যয়নব (রা)-কে তালাক দেওয়ার পর নবীজীর সাথে তাঁর বিয়ে অনুষ্ঠিত হওয়ায় তাঁর প্রতি পুত্রবধূকে বিয়ে করেছেন বলে কটাক্ষ করত। এ ভ্রান্ত ধারণা অপনোদনের জন্য এটুকু বলাই যথেষ্ট ছিল যে, হযরত যায়েদের পিতা রসূলুল্লাহ্ (সা) নন বরং তাঁর পিতা হারিসা (রা)। কিন্তু এ বিষয়টির প্রতি বিশেষ তাকীদ দেয়াচ্ছলে ইরশাদ হয়েছে ঃ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ (অর্থাৎ রসূলুল্লাহ্ (সা) তোমাদের মধ্যকার কোন পুরুষের পিতা নন। যে ব্যক্তির সন্তান-সন্ততি-দের মধ্যে কোন পুরুষ নেই, তাঁর প্রতি এরূপ কটাক্ষ করা কিভাবে যুক্তিসংগত হতে পারে যে, তাঁর পুত্র রয়েছে এবং তাঁর পরিত্যক্তা স্ত্রী নবীজীর পুত্রবধূ বলে তাঁর জন্য হারাম হবে।

এই মর্মার্থ প্রকাশের জন্য সংক্ষিপ্ত শব্দ সমষ্টি (أَبَا أَحَدٍ مِّنكُمْ) বললেই চলত। তদস্থলে কোরআনে হাকীমে অতিরিক্ত رِجَال শব্দ ব্যবহার করে এরূপ সন্দেহ অপনোদন করা হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা)-র তো হযরত খাদীজা (রা)-র গর্ভস্থ তিন পুত্র সন্তান কাসেম, তাইয়্যেব ও তাহের এবং হযরত মারিয়ার গর্ভস্থ এক সন্তান ইব্রাহীম---মোট চার পুত্র-সন্তান ছিলেন। কেননা এঁরা সবাই শৈশবাবস্থায় ইন্তিকাল করেন। এঁরা কেউই (পূর্ণবয়স্ক) পুরুষ পর্যায়ে পৌঁছেন নি। আবার এরূপও বলা যেতে পারে যে, এ আয়াত নাযিল হওয়াকালে কোন পুত্র সন্তান ছিল না। কাসেম, তাইয়্যেব, তাহের (রা) তো ইতিমধ্যেই ইন্তেকাল করেছিলেন। আর ইব্রাহীম তখন পর্যন্ত জন্মলাভই করেন নি।

বিরুদ্ধবাদীদের প্রশ্ন ও কটাক্ষের উত্তর এ বাক্য দ্বারাই হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে অপরাপর সন্দেহাবলী দূরীকরণার্থে ইরশাদ করেন ঃ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ— আরবী ভাষায় لكن শব্দ পূর্ববর্তী বাক্যে কোন প্রকারের সন্দেহের অবকাশ থাকলে তা দূরীকরণার্থে ব্যবহৃত হয়। এ স্থলে রসূলুল্লাহ্ (সা) সম্পর্কে যখন একথা বর্ণনা করা

হয়েছে যে, তিনি উম্মতের অন্তর্গত কোন পুরুষের পিতা নন; তখন এরূপ সন্দেহের উদ্রেক করতে পারে যে, নবীগণ প্রত্যেকেই তো নিজ নিজ উম্মতের জনক। এ পরিপ্রেক্ষিতে রসূলুল্লাহ্ (সা) সকল পুরুষ---বরং সমগ্র নারী-পুরুষের পিতা। তাঁর প্রতি পিতৃত্ব আরোপের কথা অস্বীকার করা প্রকারান্তরে নবুয়তকেই অস্বীকার করার নামান্তর।

وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ শব্দত্রয়ের মাধ্যমে এর উত্তর এরূপভাবে দেওয়া হয়েছে যে, প্রকৃত ঔরসী পিতা---যে ভিত্তিতে বিয়ে শাদী হালাল-হারাম সংক্রান্ত নির্দেশাবলী আরোপিত হয়---তা ভিন্ন জিনিস। আর নবী হিসেব গোটা উম্মতের আত্মিক পিতা হওয়া ভিন্ন জিনিস, এর সাথে উল্লিখিত আহ্কামের কোন সম্পর্ক নেই। সুতরাং সম্পূর্ণ বাক্যের মর্মার্থ এই দাঁড়াল যে, তিনি উম্মতের অন্তর্গত কোন পুরুষের পিতা নন, কিন্তু আধ্যাত্মিক পিতা সকলেরই।

এর মাধ্যমে কতক মুশরিক কৃত অপর এক কটাক্ষেরও উত্তর হয়ে গেল। তা এই যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) অপুত্রক। অর্থাৎ ভবিষ্যতে যে কারো মাধ্যমে তাঁর বাণী ও কর্মধারা গতিশীল থাকতে পারে ও তাঁর বংশ বজায় থাকতে পারে---এমন কোন পুত্র সন্তান তাঁর নেই। কিছু কাল পরেই এগুলো মিটে যাবে। উপরোক্ত শব্দসমূহের দ্বারা একথা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, যদিও তাঁর ঔরসজাত পুত্রসন্তান নেই, কিন্তু তাঁর নবুয়ত মিশনের প্রসার ও অগ্রগতি সাধনের জন্য ঔরসজাত পুত্র সন্তানের কোন প্রয়োজন নেই। এ দায়িত্ব রূহানী সন্তানগণই পালন করে যাবেন। যেহেতু তিনি আল্লাহ্র রসূল এবং রসূল উম্মতের রূহানী পিতা; সুতরাং তিনি প্রকৃত প্রস্তাবে তোমাদের সকলের চাইতে অধিক সন্তানের অধিকারী।

এখানে যেহেতু রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বর্ণনা এসেছে এবং নবী হিসাবে তিনি বিশেষ ও অনন্য মর্যাদার অধিকারী, সুতরাং পরবর্তী পর্যায়ে তাঁকে وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ বিশেষণে ভূষিত করার মাধ্যমে এ কথাই প্রমাণিত হয়েছে যে, তিনি নবীকুলের মধ্যে অনন্য বৈশিষ্ট্য ও বিশেষ মর্যাদায় অভিষিক্ত শ্রেষ্ঠ ও সর্বোত্তম জন। ---وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ

خَاتَمَ শব্দে দু'প্রকারের কিরাত রয়েছে। ইমাম হাসান ও ইমাম আসেমের কিরাতে خَاتَمَ এর تَاء এর উপর যবর রয়েছে। অন্যান্য ইমামগণের কিরাতানুযায়ী উক্ত تَاء যের বিশিষ্ট। কিন্তু উভয়ের সারমর্ম এক ও অভিন্ন---অর্থাৎ নবীগণের আবির্ভাব ধারার সমাপ্তি সাধনকারী। কেননা خَاتَمَ এর تَاء যের বিশিষ্ট হোক বা যবর বিশিষ্ট---উভয়ের এক অর্থ শেষও রয়েছে। আবার উভয় শব্দ মোহরের অর্থেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। দ্বিতীয় অর্থের বেলায়ও সারকথা শেষ অর্থই দাঁড়ায়। কেননা কোন বস্তু বন্ধ করে দেয়ার জন্য মোহর সর্বশেষেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যের ও যবর বিশিষ্ট

خاتم শব্দ উভয়টার উভয় অর্থই কামূস, সিহাহ্, লিসানুল-আরাব, তাজুল-উরুস প্রভৃতি শীর্ষস্থানীয় আরবী অভিধানসমূহে রয়েছে। এই তফসীরে রূহুল মা'আনীতে خاتم এর অর্থ মোহরের সারমর্ম ও শেষ বলেই বর্ণনা করা হয়েছে। রূহুল মা'আনীর শব্দ-সমূহ্ এরূপ ঃ

والخاتم اسم الة لما يختم به فمعنى خاتم النبيين الذى ختم به النبيون وماله اخر النبيين অর্থাৎ خاتم ঐ যন্ত্রের নাম যার মাধ্যমে সমাপ্তি সাধন করা হয়। সুতরাং خاتم النبيين অর্থ যার মাধ্যমে নবীগণের আগমন ধারার পরিসমাপ্তি সাধন করা হয়েছে---যার সারকথা নবীগণের সর্বশেষ ব্যক্তি।) তফসীরে বায়যাবী ও তফসীরে আহমদীতেও অনুরূপ বর্ণনাই রয়েছে। ইমাম রাগেব 'মুফরাদাতুল কোরআনে' বলেন ঃ وخاتم النبوة لانه ختم النبوة اى تممها بمجيئه অর্থাৎ তাঁকে খাতেমে-নবুয়ত এজন্য বলা হয় যে, তিনি তাঁর আগমনের মাধ্যমে নবুয়তের পরিসমাপ্তি ও পরিপূর্ণতা সাধন করেছেন।

মাহকাম ইবনে সাবদাতে (محكم ابن سبده) রয়েছে : وخاتم كل شئ وخاتمه عاقبته واخره অর্থাৎ প্রত্যেক বস্তুর خاتم বা خاتمه সে বস্তুর শেষ পরিণতি ও পরিসমাপ্তিকে বলা হয়।

সারকথা خاتم এর تاء যবর বিশিষ্ট হোক বা যের বিশিষ্ট হোক উভয় অবস্থায় অর্থ এই যে, তিনি নবীকুলের আগমন ধারার সমাপ্তকারী অর্থাৎ তিনি সবার পরে প্রেরিত হয়েছেন।

خاتم الانبياء এমন এক গুণ যা নবুয়ত ও রিসালতের পূর্ণতার ক্ষেত্রে তাঁর সর্বোচ্চ স্থান ও মর্যাদার সাক্ষ্য বহন করে। কেননা প্রত্যেক বস্তুই ক্রমান্বয়ে উন্নতির দিকে ধাবিত হয় এবং সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছলে এর পরিপূর্ণতা সাধিত হয়। আর সর্বশেষ পরিণতিই এর মোক্ষম উদ্দেশ্য; স্বয়ং কোরআনও তা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দিয়েছে ঃ اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ অর্থাৎ আজ আমি তোমাদের দীন (জীবন-বিধান) পূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামতও (অনুগ্রহ) পূর্ণ করে দিলাম।

পূর্ববর্তী নবীগণের দীনও নিজ নিজ যুগানুসারে পরিপূর্ণই ছিল,---কোনটাই অসম্পূর্ণ ছিল না। কিন্তু সার্বিক পরিপূর্ণতার কথা সর্বতোভাবে নবীজীর দীনের প্রতিই প্রযোজ্য, যা পূর্ববর্তী সবারই জন্য দলীলস্বরূপ এবং সে দীন কিয়ামত পর্যন্ত চালু থাকবে।